বীরত্বের কাহিনী

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

মিত্র এণ্ড ঘোষ
১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

অন্যান্য ছেলেমেয়েদের বই—

মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথ নাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ও আইডিয়াল প্রিণ্টার্স, ৩৩নং অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীহরিসাধন নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত।

এই বইয়ের শেষ গল্পটি ইংরেজী থেকে নেওয়া, আর বাকী গুলি মৌলিক রচনা।

মিত্র-ঘোষের কর্ত্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক সাধুবাদ ও প্রীতি জ্ঞাপন করছি। তাঁদের চেষ্টাতেই এ বই প্রকাশিত হ'ল। ইতি

১৩৪৪ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

চৈত্র

শহুরে বীর

নন্তু সেবারে বড়দিনের ছুটিতে পাড়াগাঁয়ে কাকার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। তার খুড়তুত ভাই শামু তার প্রায় সমবয়সী।

সেদিন সে শামুকে বলছিল, 'দেখ ভাই, এখানে আর আমার মন টিকছে না, কলকাতায় ফিরবার জন্যে ভারী ইচ্ছে হয়েছে। এখানে দেখবারও কিচ্ছু নেই, শোনবারও কিচ্ছু নেই। এমন জায়গায় আবার মানুষ থাকে!'

কথাটার মধ্যে ভব্যতা এতটুকু ছিল না। কেন-না, শামু তার শহুরে ভাইয়ের আদর-যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি করে নি। নিজের লাট্টু, ঘুড়ি লাটাই, জলছবি—সব কিছুই তার মনোরঞ্জনের জন্য তাকে দিয়েছে। তবু এ বলে কি! একে নেমকহারামি ছাড়া আর যে কি বলা যেতে পারে, তা শামু জানে না। কিন্তু নন্তুর স্বভাবই ওই রকম।

নন্তু শামুকে বলছিল, 'আচ্ছা শামু, কাকাবাবুর বন্দুকটা নিয়ে জঙ্গলে শিকার করতে গেলে হয় না?'

বলা বাহুল্য, নন্তু শিকার করা কাকে বলে তাই জানে না, লোকের মুখে কথাটা শুনেছে মাত্র।

শামু হেসে জবাব দিল, 'না ভাই, এ সময় শিকার করতে নেই। সরকারের নিষেধ আছে। তার চাইতে এস, আমরা তীর-ধনুক নিয়ে লক্ষ্যভেদ করি। তাতে বেশ আমোদ পাবে।'

প্রস্তাবটা শুনে শামুর ছোট বোন ছয় বছর বয়সের মিনি বলে উঠল, 'সে-ই ভাল দাদা, আমিও তোমাদের দলে আছি।'

পাড়াগেঁয়ে ছেলেমেয়ে দুটার কথা শুনে নন্তুর ভারী রাগ হ'ল। এরা বলে কি? সে জবাব দিল, 'তোমরা কি ভেবেছ আমি ছেলেমানুষ, আমায় বোকা বোঝাবে?'

সে যাই হোক, অনিচ্ছার সঙ্গে সে অগত্যা রাজী হ'ল। তীর-ধনুক নিয়ে তারা লক্ষ্যভেদে লেগে গেল। তীর-ধনুক কেমন ক'রে ধরতে হয়, কেমন ক'রে ছুঁড়তে হয়, তা অবশ্য সে জানত না। শহরে এ সবের বালাই নেই। তাই সে শামুর কাছ থেকে সব শিখে নিল। কিন্তু তার বড়াইয়ের আর সীমা নেই। সে বলল, 'এ ত ভারী সোজা, এই সোজা কাজ ক'রে অর্জ্জুন বাহবা পেয়েছিল!'

তারা তিনজনে তখন মাঠের দিকে চলল, লক্ষ্যভেদ করতে।

দূর থেকে ওবাড়ীর রাখাল ছোকরা চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'খোকাবাবু, ওদিক দিয়ে যেয়ো না, গরুটা ছাড়া আছে। মটরকেও ছেড়ে দিয়েছি (মটর একটা দুর্দান্ত গোঁয়ার পাঁঠার

নাম)। জানই ত ওরা বদমেজাজী, সামনে গেলে গুঁতোতে পারে। তোমরা একটু ঘুরে যাও।'

শামু জবাব দিল, 'বেশ, আমরা ঘুরেই যাচ্ছি।'

নন্তু কিন্তু এতে খুশী হতে পারল না। সে বলল, 'গরুকে আবার কেউ কোন দিন ভয় করে নাকি ?'

শামু জবাব দিল, 'কেউ না করলেও আমি করি। চেন না ত ওদের মঙ্গলী গাই আর পাঁঠা মটরকে। শিং নেড়ে একবার তেড়ে এলে পালাতে পথ পাবে না।'

নন্তু জবাব দিল, 'বেশ, তবে আমি মঙ্গলী না কি নাম বললে, তারই পায়ে তীর ছুঁড়ব।'

এই বলে সে এগিয়ে গিয়ে তীর ছুঁড়ল। কিন্তু একবারও তা লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারল না! তীরটা গাইটার পায়ে না লাগলেও তাকে যে বিরক্ত করা হচ্ছে, এটা সে বেশ বুঝতে পারল। কাজেই শিং সে উঁচিয়ে ধেয়ে এল। নন্তু সেই ভয়ানক জন্তুটিকে দেখেই তীর ধনুক ফেলে সটান্ দৌড় দিল।

মিনি ছুটে বাড়ী গিয়ে মাকে বলল, 'সত্যই মা, নন্তুদাদা ভারী বোকা। দাদা হলেও ওকে আমার একটুও ভাল লাগে না। কেবল মুখ-সর্বস্ব।'

নন্তু গম্ভীর মেজাজে শামুকে বললে, 'এরকম পাজী গরু ভদ্রলোকের বাড়ী রাখা ঠিক না। যাক, তোর তীরধনুকটা

একবার আমায় দে ত—না, আমি তোর কোন কথা শুনব না —একটা মজা করব। ভারী একঘেয়ে ঠেকছে।'

শামু ছেলেটি ভারী ভাল। এততেও তার মেজাজ গরম হয়নি। সে নন্তুকে তৎক্ষণাৎ তীরধনুটা দিল। নন্তু ধনুক হাতে নিয়ে তীর ছুঁড়বার আগেই আবার বড়াই করতে লাগল। সে বলতে লাগল, 'জানিস্ শামু, আমার মত তাক্ কারুর নেই। আমি ত শীগগিরই ফোর্টে রাইফল্ ক্লাবে ভর্তি হব।'

শামু বলে উঠল, 'কখন ?'

দেখলে ব্যাপার সুবিধের নয়, গেঁয়ো ছোঁড়াটা অবার প্রশ্ন করে, তখনই সে এ আলোচনা চাপা দিয়ে আর একটা বিষয় আরম্ভ করল, অথচ ছেলের বয়স তখনও দশ বছর পার হয় নি। সে তখন বলতে লাগল, 'তুই দেখ্ না আমার তাক্ কেমন ঠিক। পাঁঠাটা ত একটা বড় লক্ষ্য, ও ত মিনিও পারে। আমি ওর সামনেকার বাঁ পা লক্ষ্য ক'রে আমার এই তীর ছুঁড়ব। দেখবি কেমন মজা হয়।'

এই ব'লে সে এগিয়ে গেল। শামু তাকে বার বার নিষেধ ক'রে বলতে লাগল, 'ওকে চটাস্ নি ভাই, শুনিস্ নি রাখাল ছোকরা কি বলেছে ? তুই চলে আয়।'

নন্তুবাবু অবজ্ঞার সঙ্গে ব'লে উঠল, 'ফুঃ, একটা সামান্য পাঁঠাকে ভয় করব—আমি! আমি ওর শিং ধ'রে টানতে পারি, জানিস্ ?'

এবং নিছক অহমিকার খাতিরে সে গিয়ে মটরের শিং ধরে টান্ দিল। বলা বাহুল্য, মটর তাকে এমন গুঁতা মারল যে, সে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। মটর তখন ক্রমাগত তাকে শিং দিয়ে খোঁচাতে লাগল।

এাদকে নন্তুবাবুর উচ্চ চীৎকারে রাখাল ছোকরা দৌড়ে এল এবং মটরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে নন্তুকে বকতে লাগল, 'কেমন, আমি আগেই ত তোমাদের সাবধান ক'রে দিয়েছি বাবু, তবু কেন গেলে ওর সঙ্গে লাগতে। বেশ হয়েছে!'

নন্তুর সারা গা থেঁৎলে গেল। ভয়ে দুঃখে ও লজ্জায় সে কাঁদতে পারছিল না। উঠে গা ঝাড়া দিয়ে সে ব'লে উঠল, 'নাঃ, পাড়াগাঁ ঠিক আমার মত লোকের জন্যে নয়। এখানে আবার মানুষে থাকে!'

সে দিনই সে কলকাতায় ফিরে গেল।

শামু, মিনি, তাদের মা ও বাবা ব'লে উঠলেন, 'যাক, বাঁচা গেল! ছেলে বটে!'

বুলার সাহস

আট বছরের মেয়ে বুলা, কিন্তু মুখে তার বুড়োর মত কথা শুনলে অবাক হতে হয়।

সে দিন তারা কয় ভাইবোনে মিলে বাগানে খেলা করছিল। এমন সময় মূর্ত্তিমান শম্ভুচন্দ্র এসে হাজির। এবং পরম বিজ্ঞের মত বোনদের গম্ভীরভাবে বলে উঠল, 'যা তোরা, পালা এখান থেকে। আমাদের গোপন-সভার বৈঠক বসবে এখানে।'

বুলা বললে, 'হ্যাঁ দাদা, আমায় তোমাদের গোপন-সভায় নেবে?'

শম্ভু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলে, 'হেঃ, তোমায় নেবে না, আর কিছু। তুই কি জানিস্? মেয়েদের আমরা নিই নে। তারা কিচ্ছু বোঝে না।'

বুলার ভারী রাগ হ'ল। সে সব কিছু সইতে রাজী, কিন্তু মেয়ে বলে হেনস্থা সে আদপেই সইতে পারে না। রেগে গিয়ে বলে উঠল, 'এ তোমার ভারী অন্যায় দাদা! মেয়ে বলে বুঝি আমরা মানুষ নই? তোমরা ব্যাটাছেলেরা ভারী স্বার্থপর। মেয়েরা বুঝি বোঝে না কিছ, পারে না -কিছ? জেনো, আমরাও তোমাদের চাইতে বুদ্ধিতে বিবেচনায় কম যাই নে।'

শম্ভু ইতিমধ্যে বাগানের দেয়ালে উঠে পা দোলাতে দোলাতে পকেট থেকে একটা নাশপাতি বার ক'রে আপন মনেই খেতে সুরু করে দিল। নাশপাতি খেতে খেতে মুখ ভ্যাঙ্‌চিয়ে বলল, 'তোরা কি জানিস্ ?—তোরা ত জানিস্ কেবল কোন্দল করতে। তোদের পেটে যদি কোন কথা থাকে। আমরা ব্যাটাছেলেরা যাতে আমোদ পাই, তোরা তাতে ভয়ে আঁত্‌কে উঠবি। ছেলেদের মত সাহস মেয়েদের হতেই পারে না।'

বুলা রেগে উঠে বললে, 'হাঁ, মেয়েদেরও সাহস আছে। আমার ত ভয়ডর এতটুকু নেই।'

শম্ভু রুক্ষস্বরে বলে উঠল, 'যাঃ, যাঃ, তোকে আর জেঠামো করতে হবে না। আচ্ছা ধর্, আজ রাত্তিরে যদি ঘরে চোর ঢোকে, তাহ'লে তুই কি করবি ? চেঁচাতে চেঁচাতে পালাবি ত ?'

বুলা বলল, 'না, কক্ষনো না। পালাতে হয়, তুমিই পালাবে।'

শম্ভু লাফ দিয়ে দেয়াল থেকে নেমে পড়ে যেতে যেতে গম্ভীরভাবে বলে গেল, 'ফুঁঃ, চোরকে আমি ভয় করি নে।'

শম্ভ চলে গেলে বুলা তখন টুনুকে বললে, 'ছাখ্ ভাই টুনু, আমার মাথায় একটা ভারী মজার মতলব এসেছে।'

টুনু চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'কি মতলব সেজদি ?'

বলতে বলতে সে বুলার কাছে এগিয়ে গেল। তার

কৌতূহলের সীমা নেই, কেন-না, সেজদির মাথায় হামেশাই চমৎকার চমৎকার মতলব আসে, টুনু তা জানে।

বুলা বলল, 'শোন্ তবে। শম্ভুদা যে আমাদের চাইতে সাহসী আর চোরকে ভয় করে না, এ কথা আমি বিশ্বাস করি নে। এবং সত্যি যে আমাদেরও তার মত সাহস আছে এটা আমি প্রমাণ করে দিতে চাই। আর তা পারলে তখন আর আমাদের এতটা হেনস্থা করতে পারবে না। ওরা ব্যাটাছেলে বলে যখন তখন আমাদের ছোট মনে করে। শোন্ ভাই টুনু, আজ একটু বেশী রাতে আঁধারে চুপি চুপি ওর ঘরে গিয়ে ঢুকব এবং ওর জামা ধরে টানব। ও জেগে উঠে মনে করবে ঘরে চোর ঢুকেছে। আর তখন দেখিস্, ও ভয়ে আধমরা হয়ে চেঁচাতে থাকবে। মা-বাবা আজ বাড়ী নেই, আজকেই সুযোগ, ঠাকুমা ত সন্ধ্যার পরই ঘুমিয়ে পড়বে। সেই সুযোগেই এ কাজ করতে হবে।'

বুলা সেদিন অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত জেগে রইল। এবং তখন এগারটা বেজে গেছে, বাড়ীর লোকজন সকলেই শীতের রাতে সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে। চাকর-বাকর, ঠাকুর—কেউ আর জেগে নেই।

বুলা তখন পা টিপেটিপে উঠে টুনুকে কোলে ক'রে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। পরে তাকে জাগিয়ে চুপি চুপি বলল, 'টুনু, শীগ্গির আয়।'

খেয়ে দেয়ে টুনু সাতটার মধ্যেই শুয়ে পড়েছিল। চোখ কচলাতে কচলাতে চোখ মেলে তাকাতে লাগল।

বুলা তাকে বলল, 'দাঁড়া, আগে সব দেখে শুনে আসি, কেউ জেগে আছে কি-না। পরে এসে তোকে নিয়ে যাব।'

আস্তে আস্তে দোর খুলে বাইরে বেরিয়ে চারি দিক দেখে নিলে। কোথাও কারুর সাড়াশব্দ নেই, গোটা বাড়ীটাই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

বুলা এসে হাতের তুড়ি দিয়ে টুনুকে ডাকল।

নীরবে তুজনে বেরিয়ে গেল। শম্ভুদা যে ঘরে থাকে সেটা ওদের শোয়ার ঘরের ঠিক উপরে-তেতলায়। সিঁড়ি বেয়ে তারা উপরে উঠছিল, এমন সময় উপরে যেন কার চলার শব্দ শুনতে পেল।

টুনু ভয় পেয়ে চুপি চুপি বললে, 'সেজদি, কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?'

তারা তখন দোতলায় নেমে সিঁড়ির পাঁশে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখতে লাগল।

তারা স্পষ্টই শুনতে পেলে, কেউ যেন পা টিপে-টিপে চলছে। আর দেরী না করে তারা নিজেদের ঘরে এসে ঢুকল। টুনু কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'সেজদি, সত্যিকারের চোর নিশ্চয়ই বাড়ী ঢুকেছে। এখন উপায়?'

টুনুর কাঁধে হাত রেখে বুলা অস্পষ্টস্বরে বলল, "ভয় কি বোন্, কাঁদিস্ নে। সাহস ক'রে দেখতে হবে। চাকরবাকর কাউকে ডাকব না। চোর উপরে আছে, আমরা তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে রাস্তার একটা পাহারাওয়ালাকে ডেকে এনে চোর ধরিয়ে দিই।'

টুনু সেজদির সাহস দেখে অবাক হয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'সদর দরজা ত তালা বন্ধ, পুলিশ ডাকবে কেমন ক'রে?'

বুলা জবাব দিল, 'তাহ'লে দরোয়ানের খালি ঘরটার জানলা দিয়ে পাহারাওয়ালাকে ডাকব 'খন। আয়্ তুই।'

অঁাধারে হামা দিয়ে দিয়ে তারা নীচে নেমে এল। জানলা খুলে রাস্তায় তাকিয়ে রইল। এমন সময় টুনু ব'লে উঠল, 'ও সেজদি, চোর যে নীচে নেমে আসছে!'

সঙ্গে সঙ্গেই শম্ভু টর্চ জ্বালিয়ে টুনুর সুমুখে এসে দাঁড়াল। এবং বলে উঠল, 'কে, কে ওখানে?'

গলার আওয়াজে দাদাকে চিনতে পেরে টুনু ছুটে গিয়ে শম্ভুকে জড়িয়ে ধরল। ঢোক গিলে গিলে বলল, 'বাড়ীতে চোর ঢুকেছে, তাই সেজদি পাহারাওয়ালাকে ডাকতে এসেছে। আমরা তোমার ঘরে চোর সেজে যাচ্ছিলুম তোমায় ভয় দেখাতে, কিন্তু উপরে উঠতে গিয়েই চোরের সাড়া পেয়ে নীচে নেমে এসেছি।'

টুনুর কথা শুনতে শুনতে শম্ভু মেঝের উপর বসে পড়ে নীরবে হাসতে লাগল। তার হাসি আর থামেই না। পরে একটু থেমে সে বলল, 'সে চোর আর কেউ নয়—আমি স্বয়ং। আমিও তোদের ভয় দেখাব বলেই আসছিলুম। শুনলুম, দোতলায় কে নেমে গেল। তাই ত নীচে নেমে এলুম। বেশ ভালই হ'ল। তোরা আমায় চোর সাব্যস্ত করলি, আবার আমিও তোদের চোর মনে করেই নেমে এলুম!'

উপরে উঠতে উঠতে শম্ভু চুপি চুপি বুলাকে বলল, 'কাউকে বলিস্‌নে যেন বোন। কালকেই তোকে আমাদের গোপন-সভায় নিয়ে নেবো। চল্‌, এখন ঘুমানো যাক্‌ গে।'

নারু ও পরী

আমাদের নারুচন্দ্র ভারী চালাক ছেলে। সে যা নিজের চোখে দেখবে না, নিজের কানে শুনবে না, বা নাকে শুঁকবে না, বা জিভে চাকবে না, বা হাতে ছোঁবে না—এমন জিনিষে তার আদৌ বিশ্বাস নেই। মানুষের পাঁচটা ইন্দ্রিয়কেই সে একমাত্র বিশ্বাস করে। আর সেই কারণেই সে পরী বা ভূতপ্রেতে কখনও বিশ্বাস করতে পারে নি। কেন-না, তাদের সঙ্গে তাঁর পাঁচ ইন্দ্রিয়ের কোনটির কোন দিন মোকাবিলা হয় নি। ফলে অসুবিধেটাও তার নেহাৎ কম নয়। ইস্কুলে পূজোর ছুটি উপলক্ষ্যে তারা একখানা নাটকের পালা করবে স্থির হয়েছে, কিন্তু সেটি পরীদের নিয়ে লেখা। পরীরা যে আছে এটাই যে-লোকের বিশ্বাস নেই সে-লোক কেমন ক'রে অভিনয় ঠিক ঠিক উপভোগ করবে?

নারু তাই আপনার মনেই সেদিন বলতে লাগল, 'একবার যদি একটা পরী কোন রকমে দেখতে পেতুম,—যেমন ঘড়ি দেখছি, ট্রামগাড়ী যেতে দেখছি, ওরা সব কথা বলছে শুনছি, গান করছে শুনছি, কাঁদছে, ঝগড়া করছে শুনছি, ফুলের সুগন্ধ পাচ্ছি, এসেন্সের গন্ধে মন মাতিয়ে দিচ্ছে, রসগোল্লা পাঁপড়

ভাজা, মাংস খাচ্ছি, চায়ে চিনি না দিলে তা যেমন সহজেই বুঝতে পারছি, ঠিক তেমনই যদি একবার একটা পরী দেখতে পাই ত ভারী মজা হয়; কিন্তু যা দেখা নেই, শোনা নেই, গন্ধ পাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ছোঁয়া নেই—তা কেমন করে বিশ্বাস করি ?'

তার সঙ্গীরা তাকে এক উপায় বাত্‌লে দিয়ে বললে, 'চোখ বুজে প্রাণপণে মনে কর্ যে তুই দেখছিস্, শুনছিস্ গন্ধ পাচ্ছিস্, ছুঁইছিস্ বা খাচ্ছিস্—তাহ'লেই আর ভাবনা নেই, সহজেই তোর মতলব হাসিল হয়ে যাবে।'

কিন্তু বন্ধুদের এ পরামর্শে কোনই ফল হ'ল না, কেন-না, ওরকম গায়ের জোরে মনে করবার মত মনের নমনীয় অবস্থা তার নয় মোটেই, সুতরাং তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।

তারপর ছুটির ঠিক আগের দিন এক ভারী মজার ব্যাপার ঘটল।

নারু তার মামার বাড়ী গিয়েছিল—বেশী দূর নয়, পোয়া মাইল-টাক পথ। সন্ধ্যার একটু পরেই সে দিদিমাকে বলল, 'আমি তাহ'লে কাল আবার আসব দিদিমা।'

ব'লে পরীদের কথাই বুঝি ভাবতে ভাবতে আসছিল। আকাশে চাঁদ উঠেছে, বেশ ফুট ফুটে জ্যোৎস্না। নারুবাবু আপন মনে গুন্‌গুন্ ক'রে গান গাইতে গাইতে আসছিল, হঠাৎ পার্কটার সামনে সে যা দেখল তাতে তার বিস্ময়ের কিছু বাকী রইল না। সে দেখল, শাদা সিল্কের পোষাক-পরা একটি ছোট্ট মেয়ে, তার

দুটি রূপালি ডানা, মাথায় সোনার টোপর, শূন্যের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। সে আবাক হয়ে খানিকক্ষণ সে দিকে তাকয়ে রইল, পরক্ষণেই দু হাত বাড়িয়ে ছুটে তার দিকে এগিয়ে যেতেই সে কোথায় যেন উবে গেল। নারু ঠিক ঠাওর রাখতে পারল না। জ্যোৎস্নার আলোকে সে স্পষ্ট মেয়েটিকে দেখতে পেল, কিন্তু মেয়েটি তাকে কিছুতেই ধরাছোঁয়া দিলে না। তা না দিক নারুর মনে আর পরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু মাত্র সন্দেহ রইল না।

পরদিন সকালে উঠেই সে ব্যাপারটা সব তার সঙ্গীদের খুলে বলল। পরে একটা তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, 'তোমাদের যেমন স্পষ্ট দেখতে পচ্ছি, ঠিক তেমনই স্পষ্ট তাকে দেখলাম। সুতরাং আজ আর মনে কোন সন্দেহ নেই, তারা আছে এটা বিশ্বাস করতে আর কোন বাধা রইল না। তোমাদের নাটকের পালায় অনায়াসেই আমি যোগ দিতে পারব।'

বন্ধু বঙ্কু বাঁকা হাসি হেসে বললে, 'আমার পোষাক পরিচ্ছদের উপায়। পরীরা ত দেখছি আমায় তাহ'লে ক্ষমা করবে না!'

নারুবাবু বুঝতেই পারছিল না যে, ওরা সব হাসছে কেন?

অগত্যা মাথা নেড়ে নারু বলে উঠল, না ভাই বঙ্কু, যতক্ষণ না পরীরা এসে আমার সঙ্গে কথা বলে ততক্ষণ এ সবে আমি বিশ্বাস করতে পারি নে।'

নারু সত্যিই পাঁচ ইন্দ্রিয়কেই সাংঘাতিক রকমে বিশ্বাস করে।

নগর-কীর্ত্তন

চারখানা গ্রামের ছেলেরা মিলে সেবারে পৌষ-সংক্রান্তিতে নগর-কীর্ত্তন বার করবে স্থির হ'ল। এর আগেও তারা নগর সংকীর্ত্তন বার ক'রেছিল, কিন্তু গান ও বাজনার সঙ্গে মিল না হওয়ায় জমাট বাধে নি। এবারে তাই তারা নগরবাসীকে শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করল। নগরবাসী একজন মস্তবড় কীর্ত্তন গাইয়ে বটে কিন্তু লোকটি নেহাৎ খাঁটি ছিল, তাই বাঁড়ুজ্যেদের গৌরাঙ্গ ও মল্লিকদের পান্তি যখন তাকে গিয়ে ধরে পড়ল তখন সে তার বয়স ভুলে ছেলেদের গান ও বাজনা শেখাবার ভার গ্রহণ করল।

চারখানা গ্রামের প্রায় পনরটি ছেলে বাঁড়ুজ্যেদের নাট-মন্দিরে জমায়েত হ'ল। নগরবাসী এসে বার দুই-চার গান গাইয়ে চলে যেতে বাধ্য হ'ল—কেন-না, হঠাৎ তার শরীরটা ভারী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সুতরাং পান্তি ও গৌরাঙ্গই গান ও বাজনার তামিল দেওয়ার ভার নিল। নয় বছর থেকে সুরু ক'রে বার বছর বয়সের পনেরটি ছেলে মিলে তাদের দল তৈরি হ'ল। দলপতি গৌরাঙ্গ নিজে যে ভাল গাইতে পারত, তা অবশ্য নয়, কিন্তু হারমাদ-পনায়

তার জুড়ি মেলা ভার, বাড়ীর অবস্থাও ছিল ভাল। সুতরাং সে-ই যে দলপতি হবে সে বিষয়ে আশ্চর্য্য কি !

সে যাই হোক, সুরে বেসুরে তাদের সে চীৎকারে পাড়ার লোকেরা অস্থির হয়ে পড়ল।

ওপাড়ার ক্যাবলা এই দলের মধ্যে সকলকার চাইতে বয়সে ছোট। বেচারার বয়স সবে সাত বছর, গাইতেও সে পারে না, কিন্তু দলে মিলে গাইবার ইচ্ছা তার খুব, অথচ গৌরাঙ্গ কিছুতেই রাজী হচ্ছিল না। সে বলছিল, 'তুই ছেলেমানুষ, অত হাঁটাহাঁটি ক'রে আমাদের সঙ্গে তাল ঠিক রেখে গাইতে পারবি নে। খাম্‌কা তোকে নিয়ে কি হবে ?'

কিন্তু ক্যাবলার আগ্রহ এড়াতে না পেরে শেষটায় রাজী হ'ল।

গৌরাঙ্গ ও পান্তি গানের মহলা চালাতে লাগল। একটা গানই তারা কিছুক্ষণ গাইবে। সুরুতেই তাদের গরমিল হতে লাগল। একজন যদি করে য়্যা, আর একজন আ ব'লে এমনি ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে যে, শুনতে ভারী বিশ্রী লাগে। পান্তি সাধারণত চড়া গলায় গান ধরল, কিন্তু তার সঙ্গে তাল রেখে চড়া গলায় আর কেউ গাইতে পারল না।

প্রথমটা ঠিক হ'লেও পরের চরণেই এমন সুরের খিচুড়ি পাকিয়ে গেল যে, গৌরাঙ্গ ভারী চটে গেল। গম্ভীর হয়ে বলে উঠল, 'নীচু খাদে কে গাইছে ?'

প্রত্যেকেই একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগল, কিন্তু কে যে অপরাধী তা বোঝা যাচ্ছিল না।

গৌরাঙ্গ পুনরায় বলে উঠল, কেউ খাদে, কেউ উঁচু পর্দ্দায় গাইলে সে গান কখনও ভাল হাতে পারে না। সব মাটি হয়ে যাবে।'

ক্যাবলা এক পাশে মুখ কাচুমাচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল। উঁচু পর্দ্দায় গাইতে গিয়ে সে এমন ভাবে হাঁ করে যে, দেখলে ভয় পেতে হয়।

অপরাধীকে যখন ধরা গেল না, তখন পাস্তি পুনরায় গান সুরু করে দিল, আর গৌরাঙ্গ লক্ষ্য করতে লাগল যে, কার দোষে তাদের সকল উদ্যম ব্যর্থ হতে বসেছে

আবার সে রকম গরমিল হতে লাগল। গৌরাঙ্গ বললে, 'না, এ চলবে না। কে যেন চেঁচিয়ে সব নষ্ট ক'রে দিচ্ছে।'

এর পর সকলেই মিনিট দুই চুপ ক'রে রইল, তারপর পরস্পর চুপি চুপি কথা বলতে লাগল।

গৌরাঙ্গ হঠাৎ ক্যাবলার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'ঠিক, হয়েছে, ক্যাবলাই যত নষ্টের গোড়া। আমি তখনই বলেছি যে, তুই ছেলেমানুষ, তোর দ্বারা এ কর্ম্ম চলবে না। এখন হয় সব মাটি করতে হয়, নয় তোকে বাদ দিতে হয়।'

কিন্তু ক্যাবলাকে বাদই বা দেয় কেমন ক'রে? ক্যাবলা

তাদের করতাল ও খোলটা এনে দিয়েছে, তাই দিয়েই মহলা চলেছে।

অথচ বাদ না দিয়েই বা উপায় কি? ক্যাব্‌লা লজ্জায় ও দুঃখে জড়সড় হয়ে পড়ল। পরে বলল, 'গৌরাঙ্গ দাদা, আমায় তুমি শিখিয়ে নাও, আমি পারব।'

পান্তি তখন বলল, 'বেশ, আগে বার দুই তুই আমার সঙ্গে গেয়ে নে। তারপর সকলকার সঙ্গে গাইবি 'খন।'

গৌরাঙ্গ কিন্তু পান্তির এ প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হ'ল না। সে পরামর্শ দিল, 'ক্যাব্‌লাকে বাদ দিয়ে একবার গেয়ে দেখা যাক, যদি দেখি বেশ হচ্ছে, তাহ'লে ওকে বাদ দিতেই হবে।'

পান্তি তখন ক্যাব্‌লাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'হ্যাঁ রে ক্যাবলা, তুই কি বেসুরো চেঁচাচ্ছিলি?'

ক্যাবলা আমতা আমতা ক'রে জবাব দিল, 'তা ত বলতে পারি নে।'

কিন্তু কথা কাটাকাটির পর ক্যাবলাকে বাদ দিয়েই গান হবে ঠিক হ'ল এবং গানটা যখন শেষ হ'ল তখন সকলেই একবাক্যে ব'লে উঠল, 'কই, এবারে ত বেসুরো ঠেকল না—সকলের কণ্ঠই যেন বেশ মিলে মিশে সুরের অনুসরণ করেছে। অতএব সকলকারই এক মত যে, ক্যাবলার জন্যই গান বেসুরো হয়েছে।

ছেলেরা প্রত্যেকেই বলাবলি করতে লাগল, 'আমি তখনই

বলেছি যে, পান্তিদা, ক্যাবলাকে নিয়ে চলবে না। ওর কি তালমান কিছু জ্ঞান আছে।'

ক্যাবলা তখন পান্তির সুমুখে এসে আস্তে আস্তে বলল, 'পান্তিদা, হয় ত আমিই সুর কেটে দিচ্ছিলুম। হতে পারে, আমি বলতে পারি নে।'

বলতে বলতে তার ঠোঁট কেঁপে উঠল, সে পুনরায় বলতে লাগল, ওপাড়ার নস্তু বেশ গাইতে পারে। যদি তোমাদের দরকার হয় ত তাকে—'

ক্যাবলা আর কথাটা শেষ করতে পারল না, তাড়াতাড়ি চলে এল।

পৌষ-সংক্রান্তির দিন বিকেল থেকেই ক্যাবলার মনটা কেমন যেন দমে গেছল। সে আর সেদিন ঘরের বার হ'ল না। নিজের পড়ার জায়গায় বসে আপন মনে গুন্‌গুন্ করে কি একটা গানের সুর ভাজছিল। ওদিকে তার মা-বোন-পিসিমা পিঠে তৈরী করতে ব্যস্ত। ক্যাবলা সারাদিন ঘরের বার হয় নি দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

দূরে নগর-সংকীর্ত্তনের সুর ভেসে আসছিল। তার মা এসে বললেন, 'হ্যাঁ রে ক্যাবল, তুই ওদের সঙ্গে গেলি নে কেন? বলেছিলি না তুইও ওদের দলে গান গাইবি?'

ক্যাবলা বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে রইল। কতকগুলি ছেলে সত্যই গান গাইতে গাইতে আসছে বটে।

তারা কীর্ত্তনই গাইছে। এবং যখন তাদের বাড়ীর দিকেই তারা আসছিল, ক্যাবলা একছুটে গিয়ে বাড়ীর পিছনের দিককার বাগানে লুকিয়ে রইল।

ছেলেরা ক্যাবলাদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। ক্যাবলার মা তিলা পইছি ইত্যাদি মিষ্টি একখানা থালায় ক'রে এনে তাদের দিল। দলের একজন মিষ্টি নেবার জন্যে একটি বেতের ধামা বইয়ে নিয়ে এসেছিল, তাইতে মিষ্টিগুলি তুলে নিল। ছেলেরা গাইতে গাইতে অন্য বাড়ী চলে গেল।

তখন সন্ধ্যা প্রায় হয়-হয়। মা এসে তাকে ডাকল, কিন্তু সে সাড়া দিল না।

কীর্ত্তনের দল মাঝের পাড়ার দিকে চলে গেল। অথচ ক্যাবলাদের বাড়ীর পরের বাড়ী—মুখী ঠাকুরাণীর বাড়ী গেল না।

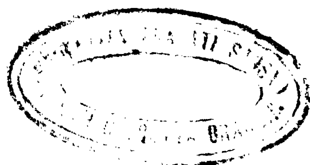
মুহূর্ত্তের মধ্যে ক্যাবলা কি ভেবে নিল। সে তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড়খানি গায়ে দিয়ে চুপি চুপি বাড়ীর বার হয়ে গেল।

মুখী ঠাকুরাণীর তিন-কুলে কেউ নেই, একখানা গাছপালায় ঘেরা ছোট্ট বাড়ীতে তিনি বাস করেন। কীর্ত্তন তাঁর বাড়ী কোন দিনই যায় না। সকলেই যেন তাঁকে উপেক্ষা করে। সকলেরই ধারণা, তাঁর বাড়ীতে গেলে তিনি তাদের সমাদর করবেন না। বেচারা দুঃখিনী কি-না।

ক্যাবলা সটান্ মুখী ঠাকুরাণীর বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল। বাড়ীখানা ফিটফাট্ পরিষ্কার। ঠাকুরাণী তখন ঘরের দাওয়ায় বসে হরিনামের মালা জপ করছিলেন। ক্যাবলা তাঁর উঠোনের এককোণ থেকে একটি কীর্ত্তন ধরল, গানটি সে ভাল ক'রেই শিখেছিল, সুতরাং গান শুনে ঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি কেরোসিনের ডিবাটা জ্বালিয়ে এগিয়ে এলেন—কে গাইছে। গান ত তাঁর বাড়ী কেউ গায় না। গান যে চিরকালের জন্যেই তাঁকে ত্যাগ ক'রে গেছে।

তিনি মন দিয়ে শুনতে লাগলেন গানটি তার নিঃস্ব একক জীবনের স্মৃতির দরজা যেন খুলে দিলে। তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনলেন। তিনি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ছেলে-মানুষের কণ্ঠ, কিন্তু তাহ'লেও তাতে যেন দরদ-মেশানো।

ক্যাবলা একবার গানটি আগাগোড়া গেয়ে পুনরায় গাইতে সুরু করে দিল।



'কে রে বাছা, তুইও একা? বেশ! আমিও একা, তুইও একা! আয় বাছা, আমরা দু'জনে বসে খানিকক্ষণ সুখ দুঃখের কথা আলাপ করি।'

মুখী ঠাকুরাণী এগিয়ে এসে ক্যাবলাকে ধরে নিয়ে গিয়ে দাওয়ার উপর বসিয়ে দিলেন।

ক্যাবলা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। এবং একখানা চাটায়ের উপর বসল।

পর পর যে দু-তিনটি গান সে জানত একে একে গেয়ে গেল। মুখী ঠাকুরাণী মনে মনে ভাবলেন, এ কোন্ শাপভ্রষ্ট দেবতা—আজ এতদিন পরে তাঁকে উদ্ধার করতে এসেছে। তিনি সকল দেহ মন দিয়ে গানের সবগুলি কথা যেন গিলতে লাগলেন। সুর, তালমান কিছুরই যেন আজ প্রয়োজন নেই।

গান শেষ হয়ে যাবার পর ঠাকুরাণী ক্যাবলাকে একখানা আমসত্ত্ব ও চারখানা বাতাসা দিয়ে বললেন, 'আমি আর কি দিব, এটুকু খাও ভাই!'

ক্যাবলা পরমানন্দে আমসত্ত্ব ও বাতাসা খেয়ে, জল খেয়ে বাড়ী চলে এল।

ক্যাবলা সেদিন শুয়ে কেবল এই কথাটাই ভাবতে লাগল যে, আজকে তার গান ওদের চাইতে ঢের ভাল, ঢের সার্থক হয়েছে।

ক্রিকেট ম্যাচ

ন বছরের দাশু। বাড়ীশুদ্ধ সবাই ডাকে—দাশুবাবু।

যেমন মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, তেমনি ফুট্‌ফুটে সুন্দর তার গায়ের রঙ, ভারি মোলায়েম স্বভাব।

পড়াশুনায় ক্লাসের মধ্যে সে সব চেয়ে সেরা। খালি পড়াশুনায় সেরা বললে অন্যায় বলা হবে,—সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে কুস্তি লড়তেও তার জোড়া নেই। গত বছর ইস্কুলে দৌড় আর লাফালাফিতে সে প্রথম হ'য়ে পুরস্কার পেয়েছিল। আবার শুনলে তোমরা আশ্চর্য্য হবে—এই ছোট্ট ন বছরের দাশু, বড় বড় পুকুর সাঁতরে পার হয়।

এ বছর তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনেকে অনেক জিনিষ তাকে উপহার দিলেন।

কেউ ফুলের তোড়া, কেউ ছবির য়্যালবাম্, কেউ বা ছোটদের ভাল গল্পের বই—এমনই কত রকম।

তার কাকামণি ছিলেন মস্ত বড় একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়।

তিনি বাজার থেকে একখানা খুব সুন্দর দামী ব্যাট কিনে এনে দাশুবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—'কাল থেকে খেলা শিখিস্। তোকে আমি বড় খেলোয়াড় বানিয়ে তবে ছাড়ব।

দাশুর আনন্দ দেখে কে !

হেসে দৌড়ে, লাফিয়ে—জন্মদিনে ধুমধামের বাড়ীখানা সে যেন তোলপাড় ক'রে তুললে। ওঃ—কাকামণির মতন ক্রিকেট খেলোয়াড় হতে পারলে, ইয়া বড় বড় গোঁফ-দাড়িওয়ালা খেলোয়াড়দের সঙ্গে সে ম্যাচ্ খেলবে। সে ত এখন ক্লাস ফোর্-এ পড়ে,—দিন পনের কাকামণির কাছে খেলা শিখতে শিখতেই সে দিব্যি ক্লাস নাইন-টেন্-এর ছেলেদের সঙ্গে খেলবে। খেলবেই সে।

পরের দিন থেকে দাশুর কাকামণি সত্যি সত্যিই দাশুকে খেলা শেখাতে সুরু করে দিলেন।

বেশী দিন নয়, দিন পাঁচ-সাত খেলতে খেলতেই দাসু ক্রিকেট খেলার ফিকিরগুলা বেশ বুঝে নিলে। এখন আর তাকে পায় কে ! ইস্কুল থেকে এসেই বই-দফ্তর রেখে ব্যাট্ করা, বল্ করা —সব অভ্যাস করে।

সেদিন ক্লাস টেন্-এর ছেলেদের সঙ্গে একটা ম্যাচ্ আছে। তারা এসে তাকে বললে—'তোকে আমরা আমাদের দলে নিতে চাই। কি বলিস ?'

দাশুর মনে মনে আনন্দ হল। তার চেয়েও বয়সে বড়রা তাকে যেচে ম্যাচ্ খেলতে ডেকেছে। ইয়ারকির কথা নয়। তাদের ক্লাস ফোর্-এ ত অনেক ছেলে রয়েছে—কে পারে তার সঙ্গে ? কাকে অমলদা ডাকলে ?

দাশুর যেমন আনন্দ তেমনই অহঙ্কার !

ম্যাচের সময় ছিল বেলা চারটেয়। দাশু কিন্তু দুটা বাজতে না বাজতেই ফ্লানেলের হাফ্-শার্ট আর খাকি হাফ্-প্যাণ্ট প'রে শাদা ক্যাম্বিসের জুতা-মোজা পায়ে দিয়ে হেলতে দুলতে ব্যাট্ হাতে ক'রে বেরিয়ে পড়ল। মাঠে গিয়ে দেখে, কারুর দেখা নেই।

সারা মাঠে শীতের মিষ্টি রদ্দুর সবুজ ঘাসের উপর এলিয়ে প'ড়েছে।

দাশু এক পাশে ব'সে ব্যাটখানা নিয়ে নাড়া চাড়া করতে লাগল প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে, এক দুই ক'রে খেলোয়াড়রা আসে আর দাশুর ব্যাটখানা দেখে খুব তারিফ করে।

সাত-আট জনের বেশী খেলোয়াড় জমল না। অথচ সময়ও হ'য়ে এসেছে।

যাদের সঙ্গে ম্যাচ হবে, তাদের ত দেখাই নেই—একটি প্রাণীও আসে নি।

দলের ক্যাপ্টেন অমল।

সে বললে, 'এরা পারবে কেন আমাদের সঙ্গে। ভয়ে এল না। যাক গে, এক কাজ করা যাক। আয় আমরা সব নিজে নিজে দু'টা দল ক'রে খেলা সুরু করি। দেখি কে কত রান ক'রতে পারে।

দাশু সব বিষয়ে ভাল হ'লেও একটা তার দোষ ছিল,

ভারি লাজুক সে। বাজে বকতে বা ইয়ারকি দিতে সে মোটেই জানত না।

সবাই যখন খেলার আমোদে আপন আপন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, দাশু তখন কোণ-ঠাসা হ'য়ে একধারে গিয়ে দাঁড়াল।

খেলা সুরু হবে, হুইসেল পড়ল।

দাশু ব্যাটখানা নিয়ে তখনও একধারে দাঁড়িয়ে। মুখ-চোরা ছেলে, এগিয়ে এসে বলতে পারে না—'কি, অমলদা, আমি কোন্ দিকে?'

অথচ সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমলেরই প্রতীক্ষা করছিল।

অমল এগিয়ে এল।

দাশুর ব্যাটখানা ওর হাত থেকে টেনে নিতে নিতে বললে—'দে ত তোর ব্যাটখানা। দেখি একবার। আজ আমি একাই একশো রান্ করব।'

দাশু ব্যাটখানা দিলে। তারপর তাকে খেলতে হবে ভেবে এক জায়গায় তৈরি হ'য়ে দাঁড়াল।

একজন একজন ক'রে সবাই ব্যাট ধরলে। কিন্তু তেমন রান্ করতে কেউ পারলে না।

অমল একাই একশো রান্ ক'রবে ব'লে স্পর্দ্ধা করেছিল, সে ত এক বলেই আউট্ হ'য়ে গেল।

দাশু কিন্তু খেটেই সারা হয়।

সে কেবল বল কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়ায়। তার পালা এল, তবু কেউ বললে না, 'দাশু, ব্যাট ধর্।'

দাশু লাজুক, মুখ-চোরা।

ব্যাট ধর্বার ইচ্ছে তার মনে প্রবল হ'য়ে থাকলেও ভাবে ভঙ্গিতে তেমন আগ্রহ দেখাল না। একমাত্র দাশু ছাড়া, একে একে সব্বাই এসে ব্যাট ধরলে। এক-একজন ক'রে আউট হয়, আর দাশুর হাত দুখানি নিশ্-পিশ্ করে। ভাবে এইবার বুঝি তার ডাক হ'বে।

কিন্তু কেউ তাকে ডাকল না।

আর ব্যাটখানা তখনও দলের পাণ্ডা অমলবাবুর হাতে। দাশু ছাড়া অন্য সকলের ব্যাট করা শেষ হ'য়ে গেলে অমল হুইসেল্ দিয়ে হাঁকলে—'ঠিক জায়গায় সব তৈরি হ'য়ে দাঁড়াও। আবার নূতন ক'রে খেলা সুরু হবে। এবার আমি আগে ব্যাট ধরব।'

দাশুর চোখ দুটি ছল ছল ক'রে উঠল। তবু সে একবার মুখ ফুটে কোনও কথা বল্তে পারল না।

অমল তখন দাশুর ব্যাটখানা বেশ ক'রে বাগিয়ে ধ'রে তৈরি হয়েছে। বল্ পেলেই যেন মারবে।

ঠিক এমনই সময় ইস্কুলের হারু মাষ্টার এসে হাজির। ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন—'ওদের দল বুঝি আসেনি? তোমরা সব নিজে নিজে খেলছ? এ কি,—বাঃ বাঃ এ যে দাশুবাবুও

খেলতে এসেছে দেখছি। বেশ বেশ! তা কে কত রান্ করলে হে অমল?'

অমল বললে—'কেউ সে রকম কিছু করতে পারেনি স্যর্। সব শুদ্ধ মোট সতের রান্ হয়েছে।

হারু মাষ্টার তখন দাশুর দিকে ফিরে বললেন—'আর তুমি? তুমি একা কত রান্ করলে দাশু?'

দাশু কিছু না বলতেই অমল তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—'ও ত নেহাৎ ছেলেমানুষ। মোটে ক্লাস ফোর-এ পড়ছে, ও কি আর ব্যাট করতে পারে, স্যর? ওকে আমি খেলা দেখতে ডেকে এনেছি। ব্যাট করতে দিয়ে শেষটায় খুন জখম হবে?'

হারু মাষ্টার বললেন—'সে কি! দাশু একবারও ব্যাট করে নি?'

অমল জবাব দিলে—'নাঃ। আমিই ত ওর হয়ে ব্যাট করছি।

হারু মাষ্টার হেসে বললেন—'ও, তাই না কি! বেশ বেশ। তা, অমল, তুমি দেখছি নতুন ব্যাটও একখানা কিনে ফেলেছ! খাসা ব্যাট ত!'

অমল লজ্জিত হ'ল। মুখ নামিয়ে বললে—'ব্যাটখানা আমার নয়, স্যর,—দাশুর।'

হারু মাষ্টার বললেন,—'তাই না কি! দাশুবাবুকে তবুও তোমরা ব্যাট করতে ডা'ক নি! যার এমন সুন্দর ব্যাট থাকে,

সে বুঝি খেলতে জানে না ভেবেছ ?······আচ্ছা, আমাকেও নেবে তোমরা ?

ছেলেরা সকলেই খুশী হয়ে উঠল।

খেলা সুরু হ'ল।

হারু মাষ্টার এক সময় দাশুকে ডেকে বললেন—'ব্যাট ধ'র দাশু। এইবার তোমার পালা।'

অমল বললে—'ছেলেমানুষ, ও কি আর খেলতে পারবে ?'

তবু মাষ্টার মশাই দাশুকেই ব্যাট করতে বললেন।

মাঠের সব ছেলেই ক্লাস ফোর-এর দাশুবাবুর খেলা দেখে অবাক ! কারুর চোখে আর পলক পড়ে না যেন !

দাশু পাক্কা আধ ঘণ্টা ধরে ব্যাট ক'রে সবশুদ্ধ তেইশ রান্ করলে। অত আর কেউ করতে পারে নি। মাষ্টার হারুবাবুও পারেন নি।

যে বল্‌গুলি তীরের মত বেগে আসে, দাশু সেগুলি আস্তে ঠেকায় আর যে সব বল্ খুব বেশী জোরে আসে না, দাশু সেই-গুলিই হিট্ করে।

শেষটায় কট্-আউট্ হয়ে গেল সে।

হারু মাষ্টার তখন দাশুকে বললেন—'সাবাস দাশুবাবু ! এইবার তুমি বল্ কর।'

অমল ব্যাট ধরেছে।

দ্বিতীয় বলেই দাশু মাঝের ক্রিকেটখানা উড়িয়ে দিয়ে অমলকে আউট ক'রে ফেললে।

ছেলের দলে হাততালি পড়ে গেল। আর কি সে হাসি!

হারু মাষ্টার তখন দাশুর পিঠ চাপড়ে বললেন—'ভারী খুশী হলাম দাশু। জান হে, ছোকরারা? শুনছ অমল! দাশুকে তোমরা ছেলেমানুষ ভেবে অগ্রাহ্য ক'র না। দেখবে, তোমাদের মধ্যে এই দাশুই একদিন সত্যিকারের পাকা খেলোয়াড় হতে পারবে।'

সেদিন দাশুর চেয়েও বেশী আনন্দ হয়েছিল কার জান?-
দাশুর কাকামণির।



দেশী কুকুর

পিলু অনুনয়ের সঙ্গে বলে উঠল, 'কিন্তু মা, ও খুব চালাক, দেখতে বেশ সুন্দর। দেখবে, দুদিনেই বাড়ীর সব ইঁদুর মেরে শেষ ক'রে দিবে। ও ইঁদুরের যম। সেদিন দেখি কি-না আমাদের সুমুখেই ও প্রকাণ্ড একটা ইঁদুর মেরে ফেললে। তাই জন্যেই ত এনেছি।'

পিলুর ছোট বোন টুকি দাদার কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে বললে, 'দেখতেও খারাপ বলতে পারবে না, তবে একটু নোংরা থাকে, এই যা। ও থাকুক মা, কেমন?'

কিন্তু সান্যাল-গৃহিনী সহজে দমবার পাত্রী নন, তিনি কিছুতেই রাজী হ'লেন না। তিনি কেবলই বলতে লাগলেন, 'রাস্তার আপদ ঘরে টেনে আনা কেন বাপু, ও আপদ বিদেয় ক'রে দাও। হ্যাঁ, হ'ত একটা ভাল জা'তের কুকুর, তবু না হয় তোমাদের কথা রাখতে পারতুম। না বাপু, ওকে আমি ঘরে জায়গা দিতে পারব না, রান্নাঘরে ঢুকে কাল খাবার নষ্ট করেছে, বিছানা পত্রও নষ্ট করে, যেখানে সেখানে গা ঝেড়ে লোম ছড়িয়ে রাখে। ছেলেপিলের ঘর, এত অনাচার বরদাস্ত

আমার হবে না। তোমাদের টমা, না কি, ওকে এখনই নিয়ে গিয়ে কোথাও রেখে এস। তোমরা যদি ওকে না সরাও ত আমি নিজে তাড়াবার ব্যবস্থা করছি।' এই বলে তিনি অন্য-কাজে চলে গেলেন।

মায়ের প্রাণে যে দয়ার অভাব, তা অবশ্য নয়, কিন্তু তাই বলে সংসারের অত খাটুনীর পরও যদি আবার কুকুরের জন্য খাটুনী বাড়ে ত তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

মায়ের ইচ্ছার যে নড়চড় হবে না, তা পিলু ও তার বোন টুকি বেশ ভাল ক'রেই জানত। তাই আর আপত্তি না ক'রে টমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর বার হয়ে গেল। পিলুর মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল, টুকি বেজার মুখে চুপ ক'রে ছিল, আর অবোলা টমা তার মনিবদের অসুবিধার কথা বুঝতে পেরে সহানুভূতির সঙ্গে লেজ নাড়তে লাগল।

সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে সে ছিল সত্যই রাস্তার কুকুর, এমন কি তার একটা নামও ছিল না। কিন্তু সেদিন বড় খালের ধারে একটা বড় ইঁদুরকে কাবু করতে দেখে পিলু ও টুকি তাকে যত্ন ক'রে বাড়ী নিয়ে আসে। সেই থেকে সে আশ্রয় পেয়েছে, ভাল খাবার ও শয্যা তার মিলেছে। সবার উপর এই দুটি ভাইবোনের ভালবাসা সে পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার নামকরণ হয়ে গেছে,—টম্। এত আদর যত্ন জীবনে সে কখনও পায় নি।

টুকি কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'আমরা ওকে ছাড়তে পারি নে দাদা, কি বল ?'

পিলু জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই না। কিন্তু এখন কি করা উচিত তা ত ভেবে ঠিক করতে হবে।'

রাগে অভিমানে পিলু মাটীর উপর বার কয়েক পা ঠুকল। এবং কি মনে ক'রে আমবাগানের দিকে এগিয়ে চলল। বর্ষার জল পেয়ে চারদিকে বিস্তর আগাছা গজিয়ে পথ চলা অসম্ভব ক'রে তুলেছে। তারই মধ্যে দিয়ে পিলু টুকি ও টম্‌কে নিয়ে এগিয়ে চলল, বৃষ্টির জলে গাছপালা সব ভিজে আছে ; তাদের জামা-কাপড়ও সব ভিজে গেল। সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। বাগানের মধ্যখানে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে তুই ভাই-বোনে বসে পড়ল। টম করুণ দৃষ্টি মেলে পিলুর দিকে চেয়ে রইল।

টম্‌কে কোথায় রাখা যায় এই হ'ল তার ভাবনা। পাড়ার কারুর বাড়ীতেই টমের স্থান হবে না, যাদের বাড়ীতে হতে পারত তাদের প্রায় সকলের বাড়ীতেই কুকুর আছে। আর, যার-তার বাড়ীতে ত টমকে তারা তুলে দিতে পারে না। টম ভাল জা'তের কুকুর হলেও কোন কথা ছিল না, জা'তের নামেই চলে যেত, দোষগুণের কোন কথা উঠত না।

তারা তখন ভাবল, আচ্ছা, এমন একটা গোপন জায়গা পাওয়া যায় না, যেখানে টম থাকতে পারে, আমরা ঘর থেকে

খাবার নিয়ে গিয়ে তাকে খাইয়ে আসতাম !

পিলুর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, মল্লিকদের ছাড়া-বাড়ীতে অনায়াসেই ত টম থাকতে পারে, কেউ কোথাও নেই। উত্তমার মা বুড়ী বাড়ীর তদারক করে, তাকে বললে সে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। বরং খুশীই হবে। কেন-না, একটা কুকুর বাড়ীতে থাকলে চোরবদমায়েসের ভয় থাকবে না। আর খেতে ত আর তাকে দিতে হবে না !

অগত্যা ওইখানেই রাখা স্থির হ'ল।

কিন্তু একটা মুশ্‌কিল হ'ল, টমকে রোজ গিয়ে খাবার দিয়ে আসবে কেমন ক'রে ? মল্লিক-বাড়ী যেতে প্রকাণ্ড একটা খাল, ভাদ্রের বর্ষায় তার দুকূল ছাপিয়ে উঠেছে। সাঁতরে যাওয়া-আসাও ত সম্ভব নয় ! এখন উপায় ?

ঠিক ঠিক, ঠিক হয়েছে। কালাচাঁদদের একটা কলাগাছের ভেলা আছে। সেইটেয় চড়ে যাওয়া-আসা করলেই সুবিধে হবে। দুপুর বেলা সেটা তাদের ঘাট থেকে চুরি ক'রে নিয়ে ঘুরিয়ে বাগানের ঘাটে এনে রাখতে হবে। এখানে কেউ আসে না, সুতরাং কেউ দেখতেও পাবে না।

পিলু তখন টমের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'টম্ লক্ষ্মীটি, তুমি এখন এইখানটায় চুপ ক'রে শুয়ে থাক, দুপুরে এসে আমি তোমার থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিব। টুকি এসে খাবার দিয়ে যাবে। কোন ভয় নেই তোর, আমি তোকে ছাড়ব না।

কিছুতেই।'

এই ব'লে পিলু একগাছি শিকল দিয়ে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে টমকে বেঁধে রেখে চ'লে এল। বাড়ী এসে মাকে কিছুই বললে না। মধ্যাহ্নে খেয়ে মায়ের অজ্ঞাতে একটা বাটিতে করে ভাত ও মাছ নিয়ে গিয়ে টমকে খাইয়ে এল। তারপর কালাচাঁদের পিসিমা যেই খেয়ে ঘুমিয়েছে, সেই ফাঁকে চুপি চুপি একাই পিলু কলাগাছের ভেলাখানা চালিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের আমবাগানের ঘাটে মোতায়েন করল। কিছু বিচালীও সঙ্গে নিল টমের বিছানার জন্যে। তারপর বেলা চারটের সময় টুকি ও টমকে নিয়ে ভেলায় উঠে স্রোতের মুখে ভেলা চালিয়ে মিনিট দশের মধ্যেই মল্লিক-বাড়ীর ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। আকাশে তখন মেঘ ছিল না, দিব্যি পরিষ্কার আকাশ।

তাড়াতাড়ি দড়ি দিয়ে ভেলাখানা একটা ছোট গাছের সঙ্গে বেঁধে তারা উপরে গিয়ে উঠল। সবদিক দেখে শুনে বারান্দার এক কোণে একটা ভাঙা কেনেস্তারার বাক্স দেখতে পেয়ে পিলু আনন্দে নেচে উঠল। হাত তালি দিয়ে সে টুকিকে ব'লে উঠল, 'বাঃ, দিব্যি হবে! এই বাক্সে বিচালী বিছিয়ে দিব্যি বিছানা হবে, বাইরে থেকে কেউ দেখতেও পাবে না। ভারী মজা!'

টম হয় ত পিলুর আনন্দের কারণটা বুঝতে পারলে। কেন-না, সেও লেজ নেড়ে নেড়ে পিলুর পা চাটতে লাগল।

পিলু চারিদিক খুঁজে পেতে একটা ভাঙা পুরান দরমা

কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে টমের বাক্সটি ঢাকা দিবার জন্য বেড়ার মত ক'রে আটকে দিল। এই সব কাজ করতে করতে বেলা প্রায় পড়ে আসছিল, কিন্তু সেদিকে তাদের লক্ষ্যই ছিল না। সব ঠিকঠাক করতে করতে সে তন্ময় হয়ে কেবল টমের ভবিষ্যৎই ভাবছিল। ছাড়া-বাড়ীতে ইঁদুরের আমদানিও নিশ্চয় আছে, চাই কি, শিকারও তার বেশ মিলবে।

কিন্তু এদিকে চারদিক আঁধার ক'রে শীঘ্রই যে বর্ষা নামবে সে দিকে তাদের কারুরই খেয়াল ছিল না। বিদ্যুতের চমকে তাদের খেয়াল হ'ল যে, ঘরে ফিরতে হবে! এখন উপায়! তখন বাতাস জোরে বইতে সুরু ক'রে দিয়েছে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টিও নেমে এল।

পিলু মনে করলে, বর্ষার জল অল্পক্ষণ বাদেই থেমে যাবে, কিন্তু ঝড়বৃষ্টি থামবার নাম নেই। ক্রমে আরও জোরের সঙ্গে জল ঝড় হতে লাগল। তখন ত আবার খাল পার হওয়া যায় না! কি করে, তারা ভাই-বোন টমকে নিয়ে বারান্দায় কেনেস্তারা বাক্সের উপর বসে ঠাকুরের নামই বোধ করি জপ করছিল।

পিলু একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, কিছুই বোঝবার জো ছিল না। তা নেই থাক, ঝড় জল যে শীঘ্র থামবে না—এটা সে ঠিক বুঝতে পারল। এদিকে খালের জল ক্রমশ বেড়ে বেড়ে বাড়ীর উপর উঠল, স্রোতের বেগ তখন

ভয়ানক! ভেলাখানার কি অবস্থা দেখবার জন্যে জলে ভিজেই কোন রকমে সে ঘাটে এল, কিন্তু ভেলার নামগন্ধ কোথাও নেই দেখে পিলুর ভয়ের আর সীমা রইল না। বাতাসের এক একটি ঝাপটে জল যেন ফুলে ফুলে উঠছিল। একটা গাছ হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ে গেল। এদিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাহাতক ভেজা যায়। পিলু টুকিকে বিপদের কথা সব বুঝিয়ে বলল। কিন্তু ছেলেমানুষ টুকি বিপদের কিচ্ছু কারণ ঠিক করতে পারল না। সে দাদাকে বলল, 'ভয় কি দাদা, ঝড় থামলে চেঁচিয়ে ডাকলেই ত ওরা শুনতে পাবে, আর বাবাকে খবর দিলেই তিনি এসে আমাদের নিয়ে যেতে পারবেন। খাল দিয়ে ত কত লোক নৌকো নিয়ে যাওয়া আসা করে, তাদের কারুর নৌকায় অনায়াসেই আমরা পার হতে পারব।'

মুহূর্তের জন্য পিলুর মনের ঘোর কেটে গেল। সে ব্যাপারটাকে একটা খেলা বলেই ধ'রে নিল। কিন্তু আধঘণ্টার পরও যখন ঝড় জল না থেমে বেড়েই চলল, তখন ত আর চুপ ক'রে থাকা চলে না! এদিকে জল গোটা বাড়ীখানাকে গ্রাস ক'রে ফেললে, আর মিনিট দশেকের মধ্যেই বারান্দায়ও জল উঠবে।

অবিলম্বেই জায়গাটা ছাড়তে হবে, নইলে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট, জলের তোড় তাদের ভাসিয়ে নিয়েও যেতে

পারে। কিন্তু ওপারে যাবে কেমন করে? ভেলাখানা ত কোথায় ভেসে গেছে। নিজে সাঁতার কাটতে পারে বটে, কিন্তু টুকি? টুকি কেমন ক'রে পার হবে? হঠাৎ তার মনে পড়ল, আচ্ছা টমকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে হয় না? আমাদের দেখতে না পেয়ে মা-বাবা নিশ্চয়ই কত ভাবছেন, টমকে দেখতে পেলেই আমাদের কথা শুধোবেন। তখন খোঁজ ক'রে আমাদের সাহায্যের জন্য নিশ্চয়ই আসবেন। টম বেশ সাঁতরাতে পারে। সে-ই ঠিক হবে, কি বলিস্ টুকি, টমকেই পাঠিয়ে দিই?'

তৎক্ষণাৎ টমকে নিয়ে হাঁটুজল ভেঙে সে ঘাটের কাছে গেল। এবং টমকে লক্ষ্য ক'রে বললে, 'দেখছিস্ ত টম, তোর জন্যেই বিপদে পড়েছি, যা লক্ষ্মী, বাড়ী গিয়ে বাবাকে খবর দে।'

এই ব'লে একটা ঢিল ওপারে ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই টম জলে ঝাঁপ দিল। উজান ঠেলে সে ওপারে যেতে পারল না, ফিরে এল। তখন পিলু তাকে আচ্ছা ক'রে মেরে জলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল।

অবোলা টম তখন মনে করল পিলু সত্যি তাকে চ'লে যেতে বলছে। অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং সাঁতরে অনেক কষ্টে ওপারে গিয়ে পৌঁছুল। টম যতক্ষণ না ওপারে গিয়ে উঠল, পিলু এপার থেকে তাকে লক্ষ্য ক'রে

খালি ঢিল ছুঁড়ে মারতে লাগল।

এপার থেকে পিলু চেঁচিয়ে বলল, 'টম, বাড়ী যা, বাড়ী।'

পিলু যে হঠাৎ তার উপর কেন বিরূপ হয়েছে টম তা বুঝতে পারল না।

সে ভেউ ভেউ ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে বাড়ী ছুটে গেল। শীতে, মারের চোটে ও দুঃখে তার সারা গা তখন কাঁপছিল।

এদিকে পিলুর বাবা জল ঝড় উপেক্ষা করেও ছেলেমেয়েকে খুঁজতে বার হয়েছিলেন। বাগানের পথে টমকে ছুটে আসতে দেখে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই যে টম, পিলু টুকি কোথায় রে? এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?'

টম জবাব দিল, ভেউ!

পিলুর বাবা তখন বলে উঠলেন, 'চল্‌, তারা কোথায়, দেখিয়ে দিবি।'

টম তখন একবার পিলুর বাবার কাছে আসে, আবার ছুটে বাগানের ঘাটের দিকে যায়, এমনই ক'রে বার কয়েক যাওয়া-আসা করায় তিনি মনে করলেন তারা বুঝি জলে ডুবে গেছে। তাই পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় পিলু, কোথায় টুকি?' টম ফের বাগানের ঘাটের দিকে ছুটে গিয়ে মল্লিক-বাড়ীর দিকে তাকিয়ে ভেউ ভেউ ক'রে বোঝাতে চেষ্টা করল।

কিন্তু তিনি তবু বুঝতে পারলেন না। তখন অবোলা পশু টম আর একবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে ওপারে গিয়ে

উঠল। তখন তিনি বুঝতে পেরে চীৎকার ক'রে বললেন, 'ভয় নেই পিলু টুকি, আমি নৌকা নিয়ে আসছি।'

তিনি ছুটে বাড়ী গিয়ে চাকর গঙ্গাকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটে এসে তাড়াতাড়ি নৌকা নিয়ে মল্লিক-বাড়ী গেলেন। তাঁরা যতক্ষণ না এলেন, টম কেবলই চীৎকার ক'রে তাদের অবস্থিতি জানিয়ে দিচ্ছিল।

যথাসময়ে ছেলেমেয়ে ও কুকুর নিয়ে কর্ত্তা বাড়ী ফিরলেন। জলে ভিজে শীতে ও ভয়ে তারা দুজনেই তখন হি হি ক'রে কাঁপছিল। মা তাড়াতাড়ি গামছা এনে তাদের হাত-পা-গা মুছিয়ে দিয়ে গরম জামা কাপড় পরিয়ে গরম গরম খানিকটা দুধ খাইয়ে দিলেন।

একটু বাদে বাড়ীর সকলে এসে তাদের কি হয়েছিল, কেমন ক'রে কেন ওখানে গিয়েছিল—সব জানতে চাইল। পিলু বিজয়ী বীরের ভঙ্গীতে সব বলতে লাগল। এবং টমের গুণেই যে সে বাড়ীতে খবর দিতে পেরেছে, নইলে সেখানে মরেই যেত, এই কথাটি গম্ভীরভাবে বলে তার বলা শেষ করল।

সকাল সকালই ভাইবোনে খেয়ে নিল এবং টমকেও খাওয়াল। টমের তখন দাম ঢের বেড়ে গেছে। তাই টুকি সাহস করে তাকে নিয়ে গিয়ে শোবার ঘরের এক কোণে একটা কাঠের বাক্সের উপর শুইয়ে দিল।

মা ঘরে আসতেই দেখেন টমের শয্যা রচনা হয়েছে, ভাই-বোনে মিলে তাকে আদর করছে, আর দূরে খাটের উপর তাদের বাবা তামাক টানতে টানতে ছেলেমেয়ের কাণ্ড দেখছেন।

মা টমকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'রাস্তার কুকুরই আমার ভাল, তোর জন্যই ত ওদের ফিরে পেলুম। বেঁচে থাক্, তোকে আর কোথাও যেতে হবে না।'

মায়ের কথা শুনে ভাই বোনের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। অর্থ—টমের জন্য আর থাকবার জায়গা খুঁজে বেড়াতে হবে না।

অভিযান

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। চারিদিক থম্ থম্ করছে; যেন প্রলয় ঘনিয়ে আসছে। কালো কালো মেঘগুলি সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। ফলে আঁধার আরও এত বেড়ে গেছে যে, অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠতে হয়। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর বজ্রের কড়্ কড়্ শব্দ চারিদিকের নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে ভঙ্গ করছে। এমন সময় সহসা চারিদিক কাঁপিয়া গুম্ গুম্ শব্দ শোনা গেল, দেখতে দেখতে ভীষণ ঝড় উঠল। ঝড়ের সে দাপাদাপিতে স্থির ধীর প্রশান্ত মহাসাগরও ফুলে ফুলে গর্জ্জে উঠছিল। পাহাড়ের মত বড় বড় এক একটা ঢেউ এসে জেটীতে আছড়ে পড়ছিল। জল-কল্লোলের শোঁ শোঁ শব্দ শুনে মনে হ'ল, প্রশান্ত মহাসাগরও যেন গর্জন করছে। মহাসাগরের চেহারাই যেন বদলে গেছে—রঙও। ঢেউয়ের মাতামাতি, কল্লোলের গর্জ্জন—সব মিলে প্রশান্ত মহাসাগর যেন প্রলয় নাচন সুরু করে দিয়েছে।

এমনই যখন অবস্থা তখন একখানা ছোট জাহাজ হু হু ক'রে ছুটে চলেছে পথহারা পথিকের মত। আশ্চর্য্যের বিষয়,

জাহাজের কাপ্তান, মাঝি-মাল্লা, লোক-লস্কর, যাত্রী—সবই কিশোর, বালকও তাদের মধ্যে আছে।

বালকদের মধ্যে যারা বয়সে বড় তারা প্রাণপণে জাহাজের গতি সংযত করতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু সে অবস্থায় ওস্তাদের পক্ষেই জাহাজের গতি ঠিক রাখা অসম্ভব, এরা ত ছেলেমানুষ।

ছেলেদের মধ্যে যে কয়জন বয়সে বড়, তাদের মধ্যে ডিক্ নামে একটি ফরাসী বালকই নাবিক বিদ্যা সম্পর্কে যা-কিছু জানে। মঙ্গো নামে একটি নিগ্রো বালকও সেই জাহাজে শিক্ষানবিশী করছিল, সুতরাং এতগুলি ছেলের মধ্যে এঁদের দুইজনই—ডিক্ ও মঙ্গো—নাবিকবিদ্যায় ওস্তাদ। ডিক্ মঙ্গোর সাহায্যে জাহাজের মাস্তুলটি কেটে ফেলতে প্রাণপণ চেষ্টা করল কিন্তু তাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হল। হেন্‌রি, টম্‌সন্, জেঙ্কিন্স, বেন্সন ও রিচাড নামে কয়েকটি বয়সে বড় ছোকরাও জাহাজখানিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টায় লেগে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা পাহাড়ের মত বড় ঢেউ এসে জাহাজের ডেকের উপর আছড়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মঙ্গোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মঙ্গোর সে করুণ আর্ত্তনাদে চারদিক কেঁপে উঠল। ডিক্ ছুটে এসে ডেকের অন্য প্রান্তে গিয়ে মঙ্গোর নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। তার ডাকাডাকির জবাবে সাগরের কালো জলের মধ্যে থেকে যেন

একটি ক্ষীণ আর্ত্তকণ্ঠের সাড়া পাওয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই সেই ক্ষীণ শব্দ আরও স্পষ্ট করে শোনা গেল। মঙ্গো চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ডিক্, ডিক্, এই যে আমি; শীগ্‌গির একগাছি দড়ি ফেলে দাও, আমার শরীর ক্রমেই অবশ হয়ে পড়ছে।

ডিক্ সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে তাড়াতাড়ি একগাছি দড়ি সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে দিল এবং একটু পরেই মঙ্গো সেই দড়ি ধরে জাহাজের উপর উঠে এল। খানিকক্ষণ শুশ্রূষা করার পর মঙ্গো সুস্থ হয়ে উঠল।

তখন ছোট ছোট ছেলেরা জাহাজের কেবিনে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু ঝড়ের মুখে পড়ে জাহাজ যখন অস্বাভাবিক ভাবে দুলছিল তখন তারা জেগে উঠল এবং নিজেদের অবস্থা বুঝতে পেরে ভয়ে ভাবনায় কেঁদে উঠল। ডিক্ তাদের অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা করল। জাহাজ রক্ষার চেষ্টাও ক্রমাগত চলতে লাগল বটে কিন্তু লাভ কিছু হ'ল ব'লে মনে হ'ল না। জাহাজের যে কামরায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি থাকে সেই কামরা থেকে ডিক্ দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি বার ক'রে নিয়ে চারিদিক দেখতে লাগল কিন্তু সেই অসীম মহাসাগরের বুকে এতটুকু ক্ষীণ আলোও নজরে এল না।

এমনই করে জাহাজখানি চারিদিন ধরে সেই অশান্ত মহাসাগরের বুকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ডাঙার কোন আভাষই পাওয়া গেল না। চার দিনের দিন রাত্রিতে আর একখানি

জাহাজ শোঁ ক'রে এই জাহাজখানির পাশ কাটিয়ে দেখতে দেখতে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এত সামান্য সময়ে ব্যাপারটা ঘটে গেল যে, ছেলেরা ওই জাহাজের মনোযোগ আকর্ষণ করবার কোন চেষ্টাই করতে পারল না।

পরের দিন, অর্থাৎ—পঞ্চম দিন প্রাতে ডিক সেই দূরবীণের সাহায্যে চারিদিক ভাল ক'রে নজর করতে লাগল—ডাঙা দেখতে পাবে এই আশায়। এমন সময় অতিদূরে আকাশ যেখানে সাগরের জলের সঙ্গে মিশে গেছে, সেইখানে একটা কালো রঙের কি দেখা গেল। এই কালো দাগটি ডিক্-এর প্রাণে সামান্য একটু আশার সঞ্চার করল। ডিক্ পুনরায় মন দিয়ে সেই কালো দাগটির দিকে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ দেখবার পর তার মনে এই বিশ্বাস পাকা হয়ে গেল যে, ওই কালো দাগটি আর কিছুই নয়, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে যে অগণিত দ্বীপ আছে, এটি তাদেরই মধ্যে একটি। সে তখন তার আর-আর সঙ্গীদেরও ওটা ভাল ক'রে দেখতে বলল। সকলেই এক সঙ্গে স্বীকার করল যে, ডিক্-এর অনুমানই সত্য।

প্রায় দুই ঘণ্টা বাদে সমুদ্র তীরের সেই কালো দাগটি ক্রমেই স্পষ্ট দেখা গেল। ক্রমে দ্বীপের গাছপালা দেখা গেল। সন্ধ্যার একটু আগে জাহাজখানা উপকূলের প্রায় এক মাইল দূরে একটা জলের ভিতরকার পাহাড়ের গায়ে গিয়ে হঠাৎ

আটকে গেল। অনেক চেষ্টা করেও ছেলেরা জাহাজখানিকে সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারল না। একেবারে নিরুপায় হয়েই তারা সেই নাম-না-জানা দ্বীপের দিকে চেয়ে রইল। ঝড়ের খাম-খেয়ালী মাতামাতি তখনও এতটুকু কমে নি। ফলে জাহাজখানি থেকে থেকেই দুলে দুলে উঠছিল।

এদিকে কখন যে দ্বীপটিতে সন্ধ্যার আঁধার নেমে এসে তাদের সামনে একখানি কালো পর্দ্দা টেনে দিল, ছেলেরা তা টেরও পায়নি। সে রাত্রিতে মুক্তির চেষ্টা নিরর্থক হবে মনে করেই তারা ডিক্-এর পরামর্শে খাওয়া-দাওয়া সেরে যার যার শুয়ে পড়ল। ডিক্-এর কর্ত্তৃত্ব, বলা বাহুল্য, টম্‌সন্, জেঙ্কিন্স, বেন্সন প্রমুখ কয়েকটি ইংরেজ ছেলের অসহ্য হয়ে উঠছিল এবং তাদের সে মনের ভাবও মধ্যে মধ্যে তাদের আচরণে কথায়-বার্ত্তায় প্রকাশ পেতে লাগল।

ছেলেরা হঠাৎ এমন অসহায় অবস্থায় পড়ল কেন, এই যে কয়টা দিন তারা ঝড়ের মাতামাতি, মহাসাগরের বুকে সেই অশান্ত অবস্থায় স্রোতের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে এল, এর কারণ জানবার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক হয়েছে। এখানে



সেই কাহিনীই বলব।

এরা সকলেই নিউজিলাণ্ডের অবৈতনিক শিক্ষালয়ের পড়ুয়া। ডিক্ স্মিথ ও হেন্‌রী ছাড়া সকলেই নিউজিলাণ্ডের বাসিন্দা এবং সকলেই বড়লোকের ছেলে। ডিক ও স্মিথ জাতে ফরাসী এবং দু জনেই সহোদর ভাই। হেন্‌রীর দেশ মার্কিন মুল্লুকে। এদের বাপ নিউজিলাণ্ডে কাজ করেন। এরা যে স্কুলে পড়ত সে স্কুলের ছেলেরা প্রতি বছরই ছুটিতে জাহাজে বা রেলে দূর দূর দেশে বেড়াতে যেত। সম্প্রতি এই রকম একটি ভ্রমণেরই ব্যবস্থা হয়েছিল। দিন ক্ষণও ঠিক হয়ে যায়। ভ্রমণের আবশ্যকীয় সব কিছু জিনিষপত্তরই জাহাজে তোলা হয়। যাত্রার আগের দিন রাত্রিতে ছোট ছোট ছেলেরা জাহাজে এসে ঘুমিয়ে পড়ে, পরদিন অতি ভোরেই জাহাজ ছাড়বার কথা। অভিভাবকেরা জাহাজ ছাড়বার একটু আগে এসে উঠবেন এই ঠিক হয়। রাত্তির বেলায় জাহাজের কাপ্তান, মাঝি-মাল্লা-লস্কর—সকলে মিলে শহরে গেল আনন্দ করতে, আর ছেলেরা রইল জাহাজের উপর ঘুমে অচেতন। ঠিক সেই সময় জাহাজের একজন ছাড়া আর সকলের অজানায় জাহাজখানি ঝড়ের মুখে পড়ে বার-সমুদ্রে গিয়ে পড়ল এবং শোঁ শোঁ করে ছুটে চলল। ঢেউয়ের চোটে জাহাজখানি অসম্ভব দুলছিল, এবং সেই দোলায় ছেলেদের ঘুম ভেঙে গেল এবং চোখ চেয়ে তারা যা দেখল, তাতে তাদের বুক কেঁপে উঠল। কি করবে ভেবে পাচ্ছিল

না। তার পর যা ঘটেছিল তা গোড়াতেই বলা হয়েছে।

ডিক্-এর নির্দ্দেশে যখন শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ছেলেরা যার যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল তখন ঝড়ের বেগ অনেকটা কমে এসেছে। ছেলেরা বিছানায় গা এলিয়ে দিতে না দিতেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। রাত তখন অনেক, জোয়ারের টানে জাহাজখানি জলের তোড়ে পাহাড় থেকে মুক্ত হয়ে কেমন করে যে জনমানুষহীন দ্বীপের উপর গিয়ে আছড়ে পড়ল তা কিন্তু নিদ্রিত ছেলেরা কেউই জানতেও পারল না। এবং এই লোকজনহীন নিরালা দ্বীপে যে তাদের বছরের পর বছর কেমন করে অসহায়ের মত কাটাতে হবে তা তারা তখনও বুঝতে পারে নি।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই ছেলেরা দলে দলে ডেকের উপর এসে ভিড় জমাতে লাগল। তখন পূব আকাশে সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছিলেন। সেই লোকজনহীন নিস্তব্ধ দ্বীপে কতকগুলি ছেলের আগমনে দ্বীপের বাসিন্দা—পক্ষীগুলি ভয়ে চেঁচামিচি করে চারদিকের স্তব্ধতা ভঙ্গ করতে সুরু ক'রে দিল। আগের দিন শত চেষ্টা করেও ছেলেরা যা করতে পারে নি এবং না পেরে হতাশ ও শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল আজ ঘুম

ভেঙে চোখ মেলতেই দেখে তারা নিরাপদে ডাঙায় এসে পৌঁছেছে। এবং তাদের এতটা আনন্দ হ'ল যে, তারা নৃত্য করতে লাগল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হ'ল, এ স্থানটা তাদের অজানা অচেনা, এখানে বিপদ আছে কি নেই, কিছুই ত বোঝা যাচ্ছে না। তবু তারা এই ব'লে সান্ত্বনা পেল যে, মহাসাগরের বুকে ঝড়ের মধ্যে নাকানি-চোবানি খাওয়ার চাইতে ডাঙার জীব ডাঙার ছোঁয়া পেয়ে তারা সত্যই নিরাপদ হয়েছে।

ছেলেদের মধ্যে ডিক্ ও হেনরীরই একটু যা বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, তা ছাড়া ভয়ডর কাকে বলে তাও তারা বড় একটা জানত না। কাজেই ভয় না পেয়ে উপস্থিত ব্যাপারে কেমন ক'রে সকলকার জীবন বাঁচাতে পারা যায় তারই পরামর্শ করতে লাগল। প্রথমে তারা দেখল, কি কি খাবার তাদের ভাণ্ডারে আছে, এবং কত দিন তাতে চলতে পারে। হিসেব ক'রে দেখা গেল, তাতে সকলকার কম পক্ষে চারি মাসকাল বেশ ভালভাবেই কেটে যাবে। ক্রমে তারা জাহাজের যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, পাঠাগার ইত্যাদি দেখেও অনেকটা আশা পেল।

তখন তাদের মনে হ'ল, ডাঙায় নেমে একটি নিরাপদ আশ্রয়ের অনুসন্ধান করা দরকার। কেন না, ক্রমাগত ঝড় জল হ'লে জাহাজখানা আর কত দিন টিকবে। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর একটু দূরেই একটি প্রকাণ্ড গুহার সন্ধান পাওয়া গেল এবং এইখানে আশ্রয় নিলে যে তারা অনেকটা নিরাপদ

হবে সে বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ রইল না। হেনরী একে একে ছেলেদের সাহায্যে জাহাজের আবশ্যক জিনিষপত্র সব নামিয়ে এনে গুহার মধ্যে সাজিয়ে রাখল। সেদিন ছেলেরা জাহাজের সেই ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বার হয়ে উদার আকাশের কোলে সাগর তীরে মনের আনন্দে খুব খানিকটা ছুটাছুটি ক'রে নিল। খেলার সরঞ্জাম ত জাহাজে সবই ছিল। ছেলেরা সকলেই আনন্দে মশগুল, একমাত্র স্মিথকে কেন যেন বেজার বেজার দেখাচ্ছিল। দুর্ঘটনার সুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত তার মুখে কেউ হাসি দেখতে পায় নি। সব সময়ই সে একা থাকত। কি একটা গোপন ব্যাপার যেন তার দেহমনকে পেয়ে বসেছিল। ডিক্ ছোট ভাইয়ের বেজার ভাবটা লক্ষ্য ক'রে বার বার কারণ জিজ্ঞাসা করেছে, হা রে স্মিথ, তোর কি হয়েছে? আমার কাছে সব খুলে বল্। কিছু গোপন করিস্ নে।' জবাবে স্মিথ মাথা নেড়ে জানিয়েছে তার কিছুই হয় নি, মুখে তার কথা ছিল না। ভাইয়ের বেজার ভাব ডিক্-কে ভারী পীড়া দিত কিন্তু প্রতীকারের কোন চেষ্টাই ত সে করতে পারে নি। খেলাধূলায় সঙ্গীদের সঙ্গে মাতবার চেষ্টাও সে করেছে কিন্তু তার সে চেষ্টাও সফল হয় নি।

তিন-চারি দিন ধরে সকলে মিলে জাহাজটাকে খালি ক'রে সব জিনিষ এনে গুহায়, গুহার সুমুখে জড় করল। জাহাজ-খানাকে নিয়ে কি করা যায় তখন এই হ'ল তাদের সমস্যা:

রিচার্ড কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা জানতেন, তাই সে-ই উপস্থিত সঙ্কট থেকে সকলকে নিশ্চিন্ত করল। সে বলল, এ জাহাজে যে কাঠ আছে, তাই দিয়ে একটা ঘর তৈরি ক'রে ফেলি।

কথাটা শুনে সকলেই খুব খুশী হ'ল। এবং উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিল। পরের দিন থেকেই কাজ সুরু হয়ে গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই জাহাজের কাঠগুলি খুলে ফেলল, ঘর তৈরির কাজও অনেকটা এগিয়ে চলেল। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটল যে, ঘর তৈরির সকল চেষ্টা বন্ধ হয়ে গেল।

তখন হেনরী, ডিক্ ও আরও কয়েকজন ছেলে জাহাজের লাইব্রেরী থেকে মানচিত্র এনে সেই দ্বীপটি কোথায় অবস্থিত তা ঠিক করতে চেষ্টা পেল।

এই দ্বীপটি আমেরিকারই একটা অংশ বলে হেন্‌রীর সময় সময় মনে হয়েছে, তাই মানচিত্র দেখে বিশেষ কিছু ঠিক করতে পারা গেল না। ডিক তখন জেদ ধরে বসল, সে একা এই দ্বীপে ঘুরে ফিরে এর সব কিছু দেখে শুনে আসবে। হেনরীর তাতে যথেষ্টই আপত্তি ছিল। কিন্তু সে শেষ পর্য্যন্ত ডিক্-এর ইচ্ছাতেই মত দিল।

পরদিন খুব ভোরে উঠে দু-তিন দিনের খাবার সঙ্গে নিয়ে ডিক্ সেই অচেনা দ্বীপের বুকে অজানার সন্ধানে বার হয়ে পড়ল।

রওনা হওয়ার সময় হেনরী সজল চক্ষে ডিক্‌কে দু দিনের মধ্যেই ফিরে আসবার জন্যে বার বার অনুরোধ করল এবং ডিক্‌ও বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে না পেরে দু দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে এই কথা দিয়ে গেল। হেনরী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইল।

ডিক্ বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই লোকজনশূন্য দ্বীপে সমুদ্রের ধার দিয়ে এগিয়ে চলল। ঘর-ছাড়া এই কিশোর বালকের প্রাণে দ্বীপের সে অপরূপ শোভা একটা তৃপ্তির আমেজ এনে দিল। ডিক্‌কে দেখতে পেয়ে পাখীরা দলে দলে কিচির মিচির করতে লাগল। এমনই ক'রে সৌন্দর্য্য দেখতে দেখতে ডিক সন্ধ্যাবেলা একটি ছোট্ট পাহাড়ের গোড়ায় এসে উপস্থিত হ'ল। সে তখন পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত। সর্ব্বাগ্রে কিছু খেয়ে নিল। দেখতে দেখতে চারিদিক অন্ধকার হয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। রাত্রিতে পথ চলা সম্ভব নয়, সম্ভব হ'লেও নিরাপদ নয়। আর শরীরেও আর কুলোচ্ছে না। তাই রাত্রি কাটাবার মত একটু আশ্রয়ের খোঁজ করতেই এই গুহার সন্ধান পেল। বলা বাহুল্য, এইখানেই সে শুয়ে পড়ল।

পরদিন ডিক্-এর যখন ঘুম ভাঙল তখন সে দেখতে পেল সূর্য্যের আলোকে চারিদিক ছেয়ে গেছে। পাখীর গান তাকে

সম্ভাষণ জানাল। আকাশ পরিষ্কার, কোথাও মেঘ নেই। ডিক তখন সেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারদিক আঁতি পাঁতি ক'রে দেখতে লাগল। তার সঙ্গে বাইনাকুলার যন্ত্র ছিল, তাই অনেক দূরের জিনিষও তার কাছে ঐ যন্ত্রের সাহায্যে বড় ও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। চারিদিকে কূলহীন মহাসাগরের নীল জল ছাড়া আর কিছুই নজরে এল না। আকাশে আর মহাসাগরের যেখানটার গিয়ে মিল হয়েছে সেই অতি দূরে যেন কি একটা ধোঁয়ার মত দেখা গেল কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সেটা যে কি তা ঠিক করতে পারল না। চারিদিক চেয়ে ডিক্ যা বুঝল তাতে তার এই মনে হ'ল যে, জায়গাটির চারিদিকেই যখন জল, তখন এটি কোন মহাদেশের অংশ নয়—একটি আলাদা দ্বীপ মাত্র। এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে তার অন্তরকে পীড়িত ক'রে তুলল, কাজেই আর অনুসন্ধানে কোন ফল নেই মনে ক'রে সে নিতান্ত দুঃখিত হয়েই আস্তানায় ফিরে গেল।

ফিরবার সময় পথে হঠাৎ একটা জিনিষের উপর তার নজর পড়ায় সে অবাক হয়ে গেল। একটু দূরেই লতাপাতার তৈরি একখানি কুটীর দেখতে পেল। বলা বাহুল্য, কুটীরখানি দেখে তার প্রাণে হঠাৎ একটা আশার সঞ্চার হ'ল। ওর মধ্যে কে আছে, কেমন ক'রে আছে, ওখানে গিয়ে কি দেখবে—এই সব ভাবতে ভাবতে সে কুটীরের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু একটু বাদেই তার আশা নিরাশায় পরিণত হ'ল। দেখল, কুটীরে

কেউ কোথাও নেই, শূন্য কুটীরখানি পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে মাত্র খানকয়েক কাঠের চেলা পড়েছিল। একদিন যে শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কেউ আগুন জ্বালিয়েছে তার প্রমাণও রয়েছে। ডিক্-এর বিশ্বাস হ'ল, কুটীরখানি অনেকদিন থেকেই ছাড়া পড়ে আছে। যে লোকটি একদা এখানে বাস করেছে তার সম্বন্ধে সম্ভব অসম্ভব কথা নানা তার মনের মধ্যে উঁকি মারতে লাগল। তার মনে হ'ল, হয় ত তাদেরই মত কোন হতভাগ্য নাবিক জাহাজ-ডুবী হয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। জনমানবের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে এই জনশূন্য দ্বীপে একা বাস করা অসম্ভব, তাই ডিক্-এর প্রাণে যে আশা দেখা দিয়েছিল—সঙ্গে সঙ্গেই তা নিবে গেল। আর অনর্থক দেরী ক'রে কোন লাভ নেই, তাই সে আবার পথ চলতে সুরু করল। সে যখন তাদের আস্তানায় এসে পৌঁছাল তখন সূর্য্য অস্ত যায় যায়। ডিক্‌কে দেখতে পেয়ে দলের সকলেই ছুটে এল এবং প্রত্যেকের মুখেই এক প্রশ্ন—কি দেখলে? হেন্‌রী ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। টমশন, বেন্সন—এরা অবশ্য কোন উচ্চবাচ্যই করল না। ডিক্ একে একে তার ভ্রমণকাহিনী ছেলেদের কাছে ফলাও ক'রে বলল, তার কথা শুনে তারা তাদের মুক্তি সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে গেল। অনভ্যস্ত জীবন-যাত্রায়ও ছেলেদের সময় বলতে গেলে সুখেই কেটে গেল।

ছোট ছোট ছেলেরা সব সময়ই খেলায় মেতে থাকত, তাদের সে কলকোলাহলে সেই নির্জন সমুদ্রের ছোট্ট দ্বীপটি মুখরিত হয়ে থাকত। ওদিকে টমশনও তার চেলা দুটিকে নিয়ে পাখী শিকারে মেতে উঠল। টমশনের তাক্ কখনও ব্যর্থ হয় না, তাই প্রতিদিনই দুই-চারিটা ক'রে পাখীর জীবন যেতে লাগল এবং সেই পাখীর মাংসে ছেলেদের রসনার তৃপ্তি হ'তে লাগল। একদিন তাদের মধ্যে পরামর্শ হ'ল যে, সমুদ্রে মাছ ধরা যাক, জাহাজেই মাছ ধরার জাল ছিল। ভোর হ'তে না হ'তেই তারা সাগরের বুকে জাল ফেলল এবং প্রতিবারেই প্রচুর মাছ উঠতে লাগল। একদিনে তারা যে মাছ ধরে তা এত প্রচুর যে, সাত দিন তাদের বেশ ভাল ক'রেই চলে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, টমশনের দল মোটেই মিশুক ছিল না, একটা অজ্ঞাত কারণে অপর দলের প্রতি বিরূপ ছিল। তাই ডিক্-এর কাহিনী তারা মোটেই বিশ্বাস করল না। কারণ, ডিক্ প্রভৃতি যা বুঝবে, টমশনের পক্ষে তার উল্টোটা বোঝাই স্বাভাবিক, তাই সে তার বন্ধু দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে একবার দ্বীপটার চারিদিক ঘুরে আসবে এই সঙ্কল্প স্থির করল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই হেনরীকে সে কথা জানাল। কিছুতেই যখন তারা শুনল না তখন নিতান্ত

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তাদের যেতে সম্মতি দিল। ডিক্‌ও তাদের সঙ্গে গেল। আগে যে ছোট পাহাড়টির কথা বলেছি তারা গিয়ে সেই পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছুল। একটু জিরিয়ে নিয়েই তারা পাহাড়ের উপর গিয়ে উঠল। টমশন সেখান থেকে সমুদ্রের গতি আঁতিপাতি ক'রে দেখতে লাগল। এবং তারও ডিক্-এর মতই বিশ্বাস হ'ল যে, সমুদ্র দ্বীপটিকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরে গিয়েছে। কিন্তু সে দমবার পাত্র নয় তাই আর খানিকটা এগিয়ে না গিয়ে সে কোন মতই গড়তে পারে না। তার কথা মত সকলে তার পিছন পিছন গেল। অনেক দূর গিয়ে তারা দেখতে পেল যে, সমুদ্রের তীর ভিন্ন দিক দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে। এবং যে জলরাশিকে তারা সমুদ্র ব'লে ধরে নিয়েছিল তা আসলে সমুদ্র নয়,—একটি অতি বৃহৎ হ্রদ। তাদের আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। বলা বাহুল্য, ডিক্ তার ভুল বুঝতে পেরে খুবই লজ্জিত হয়ে পড়ল। টমশনও সুযোগ পেয়ে একটু বাঁকা হাসি হেসে অন্তরের জ্বালা মিটাল। তখন তারা হ্রদের তীর ধরে চলতে সুরু ক'রে দিল। পথ হাঁটায় ও ক্ষুধায় তারা অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এবং হ্রদের তীরে জিরিয়ে নেবার জন্যে বসে পড়ল। বেলা তখন পড়ে এসেছে। এখানে বসে বসে সময় না কাটিয়ে তারা যাত্রা সুরু করল। খানিকটা যেতে না যেতেই তারা হঠাৎ একটি গুহার সন্ধান পেল। সুমুখে গিয়ে দেখে গুহার গায়ে কে ফরাসী ভাষায় গোটা কয়েক শব্দ খুদে

রেখেছে! তাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। সেখানে লেখা ছিল—এঁয়া ফাবোস—ফ্রান্স, ১৮৯৭। লেখা পড়ে তারা সকলেই অবাক হয়ে পড়ল, ডিক্-এর মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছিল না। এই নির্জন দ্বীপে তারই একজন স্বদেশবাসী নিতান্ত অসহায়ের মতই হয় ত তিল তিল ক'রে মরণের কোলে চিরশান্তি লাভ করেছে—এ কথা মনে হ'তেই বেদনায় ডিক-এর অন্তরটা কঁকিয়ে উঠল। তার প্রথম অভিযানে লতাপাতায় ঘেরা যে কুঁড়ে ঘরখানি দেখতে পেয়েছিল তার কারণ এতক্ষণে তার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

একটু পরেই তারা গুহার ভিতরটা ভাল ক'রে দেখতে লাগল। গুহার মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট কামরা—বাইরে থেকে তা বোঝবার জো ছিল না। ভিতরে নানা যন্ত্রপাতিও দেখতে পাওয়া গেল। এই গুহাটি তাদের থাকবার পক্ষে বড়ই চমৎকার হবে মনে ক'রে তারা বেজায় খুশী হয়ে উঠল। চারিদিক খুঁজতে খুজতে তারা একটি মানুষের কঙ্কাল দেখতে পেল এবং এটা যে সেই হতভাগ্য এয়ঁা ফাবোস-এরই কঙ্কাল সে বিষয়ে তাদের মনে আর সন্দেহ রইল না। কতদিন যে এই হতভাগ্য লোকজনহীন এই দ্বীপে অনাহারে কাটিয়ে তিল তিল ক'রে মরণের পথে এগিয়ে গিয়েছে তার সন্ধান কে দিবে! কত রাত্রি না ঘুমিয়ে সাহায্যের জন্য হয় ত সে সাগরের তীরে এসে ব্যগ্র হয়ে তাকিয়ে থাকত। তার সে মর্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাস হয় ত আজও

এই দ্বীপের বাতাসের সঙ্গে ঘুরে ফিরছে।

এর মধ্যে কখন যে চারিদিকে অন্ধকার নেমে এল ছেলেরা তা টেরও পায় নি। সকলের মনই তখন সেই অজানা মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে ভরে গিয়েছিল। তাদের চেতনা ফিরে আসতেই তাড়াতাড়ি তারা সেই হতভাগ্যের কঙ্কালটিকে সমাধিস্থ করল। এ সব কাজে রাত দেখতে দেখতে অনেক হয়ে গেল। একখানা কামরায় তারা তাদের শয়নের ব্যবস্থা করল কিন্তু সে রাতে তাদের কারুরই ঘুম এল না, কেবলই সেই হতভাগ্যের কথা মনে ক'রে তাদের মনের শান্তি নষ্ট হয়ে গেল।

সারা রাত জেগে তারা খুব ভোরে পুরাণো আড্ডায় যাত্রা করল। তখনও চারিদিক পরিষ্কার হয় নি। ছেলেরা ছুটে চলল। তাদের মনে তখন নতুন আড্ডার আনন্দ, শুধু তাই নয়, নতুন আড্ডায় তারা এই দ্বীপটির অবস্থান ও পথঘাট সম্বন্ধে একখানি মানচিত্র আবিষ্কার করেছিল। এই মানচিত্রখানি হয়ত হতভাগ্য এয়াঁ ফাবোস কত পরিশ্রম ক'রেই না তৈরি করেছিল।

এই মানচিত্রের সাহায্যে তারা তাদের ঘাঁটিতে অতি সহজেই এসে পৌঁছাল। তাদের দেখতে পেয়ে দলের ছেলেরা উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং ছুটে এসে তাদের সংবর্দ্ধনা করল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন দিয়ে তাদের অতিষ্ঠ ক'রে তুলল। সকলের মুখেই এক কথা—কি দেখলে?

তখন একে একে টমশন তাদের অভিজ্ঞতার সমস্ত কাহিনী বলে চলল। সব শুনে ছেলেদের মধ্যে একটা উল্লাস দেখা গেল। সেদিন থেকেই নতুন আড্ডায় উঠে যাবার আয়োজন চলতে লাগল। এই ফাঁকে রিচার্ড ভাঙা জাহাজের তক্তা দিয়ে একখানি সুন্দর নৌকা তৈরি ক'রে ফেলল। একদিন ভোরে আবশ্যক জিনিষপত্র নিয়ে নৌকাখানি সাগরের বুকে পাল তুলে দিয়ে ছল ছল শব্দে ছুটে চলল এবং দুইদিন পর তারা তাদের মালপত্র নিয়ে নতুন আড্ডায় গিয়ে পৌঁছুল। ছেলেরা তাদের নতুন আড্ডাটি দেখে ভারী খুশী হয়ে উঠল এবং নৌকা থেকে মালপত্র সব আস্তে আস্তে নামিয়ে নিয়ে গুহার ভিতর সাজিয়ে রাখল। বলতে ভুল হয়েছে, ছেলেরা আসবার সময় পাহাড়ের চূড়ায় একটা বড় নিশান পুঁতে রেখে এসেছিল —এই আশা ক'রে যে, যাতায়াত করতে করতে কোন জাহাজ থেকে কেউ তা দেখে তাদের সাহায্যে আসতে পারে।

হেনরী ও ডিক্-এর পরিচালনায় ছেলেদের এই সংসারটি বেশ ভালভাবেই চলছিল। একদিন তারা এক সভা ডেকে কাজের শৃঙ্খলা হবে মনে ক'রে ভিন্ন ভিন্ন দল গড়ে তাদের এক একদলকে এক একটা কাজের ভার চাপিয়ে দিল। সকলের মতে

এক বছরের জন্য হেনরী এই সভার স্থায়ী সভাপতি মনোনীত হ'ল। সভাপতি সকলের অভাব অভিযোগ সুখ সুবিধা ইত্যাদি দেখবেন। হেনরী বয়সে ছেলেমানুষ হ'লেও তার কর্ত্তব্য পালনে কোন দিনই এতটুকু গাফিলতি করে নি।

এদিকে শীত নেমে এল। প্রকৃতির সবুজ শোভাও দেখতে দেখতে বরফে ঢাকা পড়ে যেতে লাগল। সব যেন মড়ার মত, মাঝে মাঝে বরফের ঝড় বয়ে যায়।

হেনরীর আগের অভিজ্ঞতা তাকে অনেকটা সাহায্য করল। তাই জাহাজ থেকে যথেষ্ট গরম কাপড় চোপড় সংগ্রহ ক'রে রেখেছিল, তাই এখন কাজে লেগে গেল! আর আগুন সব সময় রাখতে হবে, তাই সে ছেলেদের সাহায্যে প্রচুর কাঠ জোগাড় ক'রে রেখেছিল। কেন-না, তারা যেখানটায় রয়েছে সেখানে বছরে ছয় মাস রাত্রি আর ছয় মাস দিন। রাত্রিতে আঁধার দূর করবার জন্যে প্রয়োজনের চাইতেও বেশী তেল জাহাজ থেকেই জোগাড় ক'রে রেখেছিল। অথচ ছেলেরা কেউ এক কথা ভাবতেও পারে নি। খাদ্য দ্রব্যেরও অভাব ছিল না। সময় থাকতেই বহু পশুপক্ষী শিকার ক'রে তাদের মাংস শুকিয়ে রেখেছিল। সুতরাং খুব বেশী অসুবিধা যে হবে না তাই ভেবে হেনরী অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল।

দেখতে দেখতে ভয়ানক শীত দেখা দিল। আবশ্যকের চাইতে বেশী গরম কাপড় ব্যবহার ক'রেও ছেলেরা হাড় কাঁপুনী

শীতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছিল না। বরফ পড়ার বিরাম ছিল না। চারিদিকে কেবল বরফ—যেন প্রকৃতিকে শাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। গাছ পালাগুলি যেন পাকা চুল দাড়ি নিয়ে বৃদ্ধের মত নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে যেন কেমন একটা অদ্ভুত রহস্য ছড়িয়ে রয়েছে—যেন প্রকৃতি নীরবে এই অসহায় শিশুদের বিরুদ্ধে বড় রকমের একটা ষড়যন্ত্র ক'রে বসেছে। এ অবস্থায় ঘরের বার হওয়া আদৌ সম্ভব ছিল না। কিন্তু এতগুলি ছেলের পক্ষে এক জায়গায় আটক থাকা যে একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ছিল, তা বলাই বেশী, কেন-না, খেলাধূলা ছুটাছুটি করাই যাদের স্বভাব আজ ভাগ্যবশে তাদের বন্দীর জীবন যাপন করতে হচ্ছে। হেনরী তাদের অবস্থা চিন্তা ক'রে ভারী অস্থির হয়ে পড়ল। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মাথায় একটা চমৎকার মতলব এল। জাহাজের পাঠ-কক্ষে যে বিরাট গ্রন্থাগার ছিল, এই সময় সেই সব বই পড়ে জ্ঞানার্জ্জন করার সুযোগ এসেছে। তারা সকলেই বিদ্যালয়ের পড়ুয়া, কাজেই লেখাপড়া তারা সকলেই কম-বেশী জানত। লেখাপড়ার দিক দিয়ে তাদের যেন ক্ষতি না হয় এই মনে ক'রে হেনরী তার সঙ্গীদের কাছে এই প্রস্তাব করল যে, অতঃপর যারা বয়সে বড় তারা ছোটদের লেখাপড়ার ভার গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য, তার এ প্রস্তাব সকলেই আনন্দের সঙ্গে মেনে নিল। এবং পরদিন থেকেই নিয়মিত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার

কাজ সুরু হয়ে গেল। সারা শীতকাল ধরে তারা একাগ্রতার সঙ্গে পড়াশুনা করল।

ক্রমে শীত কমে এল, দেখতে দেখতে একটি দুটি ক'রে পাখীরা এসে দেখা দিল। একদিন সত্য সত্যই দীর্ঘ রাত্রির প্রভাত হ'ল। এ যেন ঈশ্বরের আশার্ব্বাদ। আবার গাছপালা সব জীবন্ত হয়ে উঠল, ফুল ফুটল, চারিদিকে একটা সজীবতার আমদানি হ'ল। পাখীর গানে একটা করুণ সুর ছেলেদের মাতিয়ে তুলল। বসন্ত এসেছে!

হেনরী তার এই নবরাজ্যের বিভিন্ন জায়গা, খাড়ি-খাল, বিল, টিলা, পাহাড় ইত্যাদির নতুন নতুন নামকরণ করতে লাগল।

দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল, তাদের জীবনে নতুনত্ব থাকলেও বিচিত্রতা ছিল না কিছুই।

এই সময়ের মধ্যে টমশন ও ডিক্-এরা জনকয়েক মিলে দ্বীপটি আগাগোড়া ঘুরে এল। ডেরায় ফিরবার পথে তারা হঠাৎ একটি গরু দেখতে পেল। কিন্তু মুস্কিল হ'ল, কেমন ক'রে এই বন্য জন্তুটিকে ধরা যায়। রিচার্ড ভেবে চিন্তে একটা দড়ির ফাঁদের সাহায্যে জন্তুটাকে আটকে ফেলল। আবার কিছুদিন

পর একটি ছাগলও এই একই কায়দায় বন্দী হয়ে ছেলেদের হাতে এসে পড়ল। এই দুটি প্রাণীকে পেয়ে তাদের খাওয়াদাওয়ারও অনেকটা সুবিধা হ'ল। দুধ দিয়ে তারা পনীর ইত্যাদি তৈরি করতে সুরু ক'রে দিল। শুধু তাই নয়, দূর থেকে কাঠ বয়ে আনতেও এ দুটি প্রাণী ছেলেদের অনেক উপকারে এল।

এক বছরের জন্য হেনরী দলপতি নির্বাচিত হয়েছিল। বছর শেষ হতেই আবার নতুন নির্বাচন আবশ্যক হ'ল। এবার যে নিবাচনে একটু প্রতিযোগিতা চলবে তার লক্ষণ দেখা দিল। টমশনের দল চুপ ক'রে বসে ছিল না। যথাসময়ে ভোট নেওয়া হল, ভোট গুণে দেখা গেল যে, ডিক্ সব চাইতে বেশী ভোট পেয়েছে। ফলে টমশনের মুখ কালো হয়ে গেল। আর হেনরী ডিক্-এর সফলতায় গর্ব বোধ করতে লাগল। সে আনন্দ আর চেপে রাখতে না পেরে ডিক্‌কে আলিঙ্গন করল। কিন্তু নির্বাচনের এই ফলে ছেলেদের মধ্যে একটা অশান্তির আবহাওয়া দেখা দিল। এতদিন একদলের প্রতি আর একদলের যে বিদ্বেষ মাথা তুলতে সুযোগ পায় নি, এবারের এই নির্বাচনের পর সেই বিদ্বেষের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠে তাদের শান্তির নীড়কে অশান্তিময় ক'রে তুলল—ভয় হ'ল, পাছে এই আগুনে সব কিছু না ছাড়খাড় হয়ে যায়!

টমশনের দল অন্যান্য ছেলের প্রতি মোটেই প্রসন্ন ছিল না। তার কারণ অবশ্য কেউ জানে না, না জানবারই কথা। তবু তারা

এদের কাছ থেকে দূরে দূরেই চলতে লাগল। সারাদিন ধরে ঘরের কোণে বসে ফিস-ফাস ক'রে কি সব পরামর্শ হয়, কেউ তা বুঝতে পারে না।

শীতের সময় হ্রদের জল জমিয়ে গিয়ে বরফের স্তূপে পরিণত হয়েছিল। সেই স্তূপ তখনও গলতে আরম্ভ করে নি। একদিন ছেলেরা সকলে মিলে বরফের উপর 'স্কি' খেলতে শুরু করে, টমশনের দল এদের সঙ্গে যোগ দিল। খেলতে খেলতে তারা অনেক দূর গিয়ে পড়ল। টমশন ইচ্ছা ক'রেই আর সকলকে এড়িয়ে চলল। ডিক্ এটা লক্ষ্য ক'রে টমশনকে ফিরবার জন্যে অনুরোধ করল, কিন্তু সে তার কথায় কান দেওয়া আবশ্যক বোধ করল না। খেলা শেষ ক'রে সকলে যখন একসঙ্গে ফিরবার জন্যে এক জায়গায় মিলিত হ'ল, তখন টমশনকে খুঁজে পাওয়া গেল না। সেই বরফে ঢাকা প্রান্তরে টমশন যে বেঁচে আছে তার কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না। সঙ্গে সঙ্গেই তারা ভয়ে ভাবনায় মুশড়ে পড়ল। তখন স্মিথ প্রমুখ জন তিনেকে স্কির সাহায্যে টমশনকে খুঁজতে গেল। খানিকক্ষণ খোঁজাখুজি ক'রে তাদের দু জন ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এল, কিন্তু স্মিথ তখনও ফিরল না। এদিকে হাল্কা ধোঁয়ার মত নীল কুয়াশা দেখতে

দেখতে চারিদিক ছেয়ে ফেলল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সেই কুয়াশা দুর্ভেদ্য হয়ে উঠল। এ বিপদে তারা কি করবে ঠিক করতে পারছিল না। বেশীক্ষণ এ অবস্থায় থাকলে যে সকলকেই মরণের কোলে আশ্রয় নিতে হবে, তাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নেই জেনে ডিক্ অত্যন্ত দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে তাদের সকলকে নিয়ে আস্তানায় ফিরতে উদ্যত হ'ল। স্মিথ ও টমশন যে বেঁচে আছে এ সম্পর্কে কারুরই এতটুকুও আশা ছিল না। ডিকের সঙ্গে বাইনাকুলার (দূরদর্শন যন্ত্র) ছিল, তারই সাহায্যে সে চারিদিক বেশ ভাল ক'রেই দেখতে লাগল। হঠাৎ দূরে দুটি কালো রং-এর কি যেন দেখা গেল। দেখতে দেখতে সেই পদার্থ দুটি যেন ক্রমেই সুমুখের দিকে ধেয়ে আসছে। ডিক দমবন্ধ ক'রে তখন এই দৃশ্য দেখতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নজরে যা পড়ল, তাতে সে একটা ভীষণ চীৎকার ক'রে উঠল। সে দেখল, দুটি কালো পদার্থের আগেরটি তারই ছোট ভাই স্মিথ, আর অপরটি একটি শাদা ভল্লুক স্মিথকে তাড়া ক'রে আসছে। কিন্তু ওদের দুজনার ভিতরকার দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে, ছোট ভাইয়ের এই বিপদে ডিক নিজের বন্দুকটি নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে চলল। এর মধ্যে ভল্লুকটা প্রায় এসে পড়েছে, তাই ডিক্ কোন দিকে না তাকিয়ে তীরের মত ছুটে গেল। কিন্তু আর বুঝি ভাইকে বাঁচান যায় না। ভল্লুকের সঙ্গে স্মিথের দূরত্ব তখন মাত্র কয়েক হাত। ডিক্ও

তখন প্রায় এসে পড়েছে। সে দূর থেকেই প্রাণপণে বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিল, সামান্য একটু ধোঁয়া বার হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক গর্জ্জে উঠল। ডিকের তাক্ ব্যর্থ হয় নি, ভল্লুকটি সেই বরফের উপরই তার ভল্লুক-লীলার অবসান করল।

এরই মধ্যে টমশনও অন্য দিক থেকে এসে উপস্থিত হ'ল। দেখতে না দেখতেই কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে গেল, সামনের জিনিষও নজরে পড়ে না। আর সামান্য বিলম্ব হ'লেই এদের বাঁচান সম্ভব হ'ত না।

টম্‌শনের প্রাণে যে হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছিল তা আস্তে আস্তে বেড়ে গেল। তাই একদিন যখন টমশন তার দুটি বন্ধুকে নিয়ে আর সকলের সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে উদ্যত হ'ল, তখন তাতে কেউ তেমন ভাবে বিস্মিত হ'ল না। হেনরী কত রকমে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করল কিন্তু কোন ফলই হ'ল না। শেষটায় সত্য সত্যই টমশন একদিন প্রাতে বন্ধু দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় চাইল। তাদের এ ব্যবহারে সকলেই মর্ম্মাহত হ'ল। কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায়ই ত ছিল না তাদের হাতে, তাই শুধু চোখের জলই তাদের সার হ'ল।

টমশনদের চলে যাওয়ার পর অনেক দিনই কেটে গেছে। কিন্তু তাদের কথা কেউ ভুলতে পারে নি। ডিক আপন মনেই নিজেকে এই বিচ্ছেদের মূল মনে ক'রে মনে মনে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করছিল। তাই সে টমশনদের আবার ফিরিয়ে আনবার জন্যে সংকল্প করল। একদিন সে তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভাই স্মিথ ও বিশ্বাসী অনুচর মঙ্গোকে সঙ্গে নিয়ে টমশনের খোঁজে বার হয়ে পড়ল। স্মিথকে সঙ্গে নেওয়ারও একটা আলাদা কারণ ছিল। স্মিথ সব সময়েই কেন যেন মন-মরা হ'য়ে আছে। এর কারণ জানা দরকার মনে ক'রে এই সুযোগ সে গ্রহণ করল। আবশ্যক জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে তারা হ্রদের বুকে নৌকা ভাসিয়ে দিল। বাতাস পেয়ে নৌকোখানি তর্ তর্ ক'রে ছুটে চলল। টমশনেরা কোথায় কোন্ দিকে আছে এ খবরও যেমন তাদের জানা ছিল না, তেমনই তাদের নৌকোখানিও যে কোন্ দিকে চলেছে, কোথায় গিয়ে ভিড়বে—তাও ছিল তাদের সম্পূর্ণ ই অজানা। তারা লক্ষ্য-হীন ভাবেই ভেসে চলল। তারা তিন জনেই নীরব।

খানিকক্ষণ পর সেই নীরবতা ভেঙে ডিকই প্রথম কথা কইল। সে স্মিথকে তার এই বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করল। আরও বহুবারই এই প্রশ্ন করেছে কিন্তু ভাইয়ের কাছ থেকে কোন জবাবই পায় নি। স্মিথ এতদিন প্রাণপণ চেষ্টায় যে কথা গোপন রেখেছিল উচ্ছ্বাসের মুখে আজ আর তা গোপন রাখতে পারল না। দাদার কাছে সব কিছুই খুলে বলল। সে

অকুণ্ঠিত হ'য়েই স্বীকার করল যে, জাহাজের দুর্ঘটনার জন্যে কেউ যদি দায়ী থেকে থাকে ত সে, আর কেউ নয়। কেমন ক'রে জাহাজ চালানো হয় সে সম্বন্ধে ছেলেদের কৌতূহলের সীমা থাকে না, স্মিথও সেই কৌতূহল মেটাতে গিয়েই এই অনর্থের সৃষ্টি করেছে। ডিক যে ভাইয়ের কাছ থেকে এ রকম কিছু শুনবে তা স্বপ্নেও ভাবে নি, তাই স্মিথের কথা শুনে সে ক্ষেপে উঠল। তার অতি-কৌতূহলী ভাইয়ের বুদ্ধির দোষেই না আজ অতগুলি ছেলে চরম দুঃখের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে! কিন্তু এ ক্ষেত্রে এখন তার কিছুই করবারও নেই ... অথচ এই নিদারুণ আঘাতে সে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল।

নৌকোখানি বাতাসে ভর ক'রে ক্রমাগত ভেসে চলেছে, এ চলার যেন আর শেষ নেই। ক্রমে সূর্য্য অস্ত গেল, দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এসে চারিদিক ঢেকে দিল। ঘোর অন্ধকার—কিছুই দেখা যায় না। হ্রদের কূল দেখা যায় না। উপরে অন্ধকার কালো আকাশের বুকে অগণিত নক্ষত্র, আর নীচে অন্ধকারেরই মত কালো জলরাশি। তারই মধ্যে দিয়ে তারা ছোট্ট নৌকোখানি বেয়ে চলেছে—কোন্ দিকে, কিছুই তারা জানে না। নৌকো চালানোও ক্রমে অসম্ভব হ'য়ে পড়ল। তখন মঙ্গো তীরের দিকে নৌকোখানি চালাতে সুরু ক'রে দিল। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না।

নৌকোখানি হঠাৎ তীরে এসে ভিড়ল—দূরে মানুষের

কথা বলার শব্দ অস্পষ্ট ভেসে আসছিল। ডিক চমকে চারিদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না! তখন নৌকো থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে শব্দ লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে গেল। অদূরে কয়েকজন মানুষের ছায়া-মূর্ত্তি দেখতে পেল। অস্পষ্ট আলোকেও টমশনকে চিন্‌তে কোন কষ্ট পেতে হ'ল না।

নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে টমশনকে পেয়ে সে আপনাকে হারিয়ে ফেলল।

কিন্তু ও কি! টম্‌শনের পাশে যে একটা ভয়ঙ্কর বন্য জন্তু!

জানোয়ারটা নীরবে হামাগুড়ি দিয়ে টমশনের দিকে এগিয়ে আসছিল। ডিক্ কোথায় আছে, কি করছে—কিছু না ভেবেই ছুটে গেল। জানোয়ারটাও টমশনের উপর লাফিয়ে পড়ল। ডিক্‌ও এই অবসরে কাছে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই সে তার বন্দুকের চোঙ দিয়ে জানোয়ারটার মাথায় প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারল। অতর্কিতে এভাবে আক্রান্ত হ'য়ে জানোয়ারটা হতভম্ব হ'য়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গেই নতুন শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ল। ডিক্ এর জন্যে প্রস্তুতই ছিল, কিন্তু টাল্ সামলাতে না পেড়ে মাটিতে পড়ে গেল। জানোয়ারটার সঙ্গে তখন ডিকের জড়াজড়ি সুরু হ'য়ে গেছে। ডিক্ এক সময়ে সুযোগ পেয়ে তার বন্দুকটি কুড়িয়ে নিল এবং জানোয়ারটাকে লক্ষ্য ক'রে

ঘোড়া টিপে দিল। ভীষণ চীৎকার ক'রে জানোয়ারটা লাফিয়ে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার মাটিতে পড়ে গেল, আর উঠতে পারল না।

মুহূর্ত্তের মধ্যে এতগুলি ঘটনা ঘটে গেল, কারুর মুখেই কোন কথা নেই। ডিককে হঠাৎ এ অবস্থায় দেখে টমশন অবাক্ হ'য়ে গিয়েছিল। আগাগোড়া সব কিছুই তার কাছে একটা স্বপ্নের মত মনে হ'তে লাগল। ডিকের এই ভাবে আগমন ও তাকে বাঁচাতে গিয়ে জানোয়ার কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়া ও অবশেষে ডিকের গুলীর ঘায়ে জানোয়ারটার মৃত্যু—সব কিছুই তাকে বিমুগ্ধ ক'রে দিল। ডিকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার দু চোখ ভরে জল নেমে এল—সে ছুটে এসে ডিককে জড়িয়ে ধরে কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে ব'লে উঠল, ভাই ডিক্, না জেনে তোমার প্রাণে এতদিন কত বেদনাই না দিয়েছি, জানি কেমন ক'রে আমার সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে। তোমার মধ্যে যে সজীব প্রাণস্রোতের সন্ধান আমি আজ পেলাম—জানি নে, সে প্রাণ কত বড়, কত উদার! তবে এটুকু জানি যে, সাধারণ মাপকাঠিতে তার বিচার চলে না।

যে টমশন ডিকের জীবনকে দিনরাত দুর্ব্বহ করে তুলেছিল আজ সেই টমশনই ডিকের সামান্য অঙ্গুলি হেলনে মরণকেও বরণ করতে পারে। তাই সে উচ্ছ্বসিত আবেগে ডিক্‌কে বললে, আমার এ ক্ষুদ্র মলিন হৃদয়ের এই তুচ্ছ অর্ঘ্য গ্রহণ ক'রে আমাকে

ক্ষমা কর ভাই,—আজ থেকে জীবনে আর তোমার কাছ-ছাড়া করো না আমায়।

ডিক নীরবে টমশনকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করল। যে কল্পনায় গড়া স্বার্থ এই দুটি তরুণের প্রাণকে বিচ্ছেদে ভার ক'রে তুলেছিল, আজ মিলনের দ্বারা তার পরিপূর্ণ সার্থকতা ঘটল।

তাদের এই মিলনের খবর যখন তাদের আড্ডায় গিয়ে পৌঁছল তখন সেখানে একটা উল্লাসের ঝড় বয়ে যেতে লাগল।

অনেক দিন কেটে গেছে। নির্ব্বাসিত বালকদের জীবনে এর মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে। জাহাজ-দুর্ঘটনায় বিপন্ন আরও দুই ব্যক্তি (একজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোক) এসে এদের এখানে আশ্রয় নিয়েছে। স্ত্রীলোকটি এদের সকলকার মায়ের অভাব দূর করেছেন। তাই তাদের আর আনন্দের সীমা নেই। সকলেই তাঁকে সন্তানের মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালবাসা দিয়ে তাঁর নির্ব্বাসিত জীবনে একটা আত্মপ্রসাদ এনে দিয়েছে। মা-ই এখন সকলকার রান্নাবান্না ও সাংসারিক সব কিছু কাজ করেন, ফলে খাওয়া দাওয়াও তাদের অনেকটা উন্নত হয়েছে। মায়ের সঙ্গে যে ভদ্রলোক এসেছেন তিনি

পূর্ত্তবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ, তাই তাঁকে পেয়ে বালকদের প্রাণে মুক্তির আশা জেগে উঠল। তিনি ইতিমধ্যেই একখানি নৌকো তৈরি করতে লেগে গেছেন। নৌকো তৈরি হ'লেই তারা সকলে মুক্তির অনির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করবে। কাজেই আশা ভরা মন নিয়ে তারা দিনরাত নেচে খেলে বেড়াতে লাগল।

তার পর দেখতে দেখতে একদিন তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় নৌকোখানি তৈরি শেষ হ'ল। একদিন ভোরের বেলা তারা নৌকোখানি অকূল সমুদ্রের বুকে বেয়ে চলল—আশা ও নিরাশা দু-ই তাদের আকুল ক'রে তুলছিল।

ঢেউয়ের বুকে ছোট্ট নৌকোখানি নাচতে লাগল, ছেলেদের মনও থেকে থেকে নেচে উঠতে লাগল—জন্মভূমির কোলে ফিরবে এই আনন্দে। আজ সুদীর্ঘ দু বছর হ'তে চলল তারা মানুষের সমাজ-সভ্যতার আবেষ্টনী থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছে। ঘরে তাদের শোকসন্তপ্ত পরিজন তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও নিরাশ হ'য়ে পড়েছে।

নৌকো ছুটে চলেছে মুক্তির আনন্দে কলকল্ শব্দে সাগরের অসীম বুকে। তার চলার যেন আর বিরাম নেই। দু দিন দু রাত্রি ক্রমাগত ছুটে চলেও কোন আশার সন্ধানই পাওয়া গেল না। চারিদিকে শুধু জল, আর জল—মনে হয় উন্মত্ত সাগরের বুকে ধরিত্রীর শেষ চিহ্নও যেন নিঃশেষে মুছে লোপ পেয়ে গেছে। দু দিন দু রাত্রি চলেও আশার কোন সন্ধান না

পেয়ে ছেলেরা যখন নিতান্ত মন-মরা হ'য়ে পড়ল, ঠিক এমনই সময় দূর দিগন্তে কালো ধোঁয়ার মত কি একটা দেখা গেল। রুদ্ধ নিশ্বাসে সকলে অপলক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে রইল— ওটা মরীচিকা, না বাস্তব সত্য, তা জানবার জন্যে।

কিন্তু খানিক পরেই সেই কালো ধোঁয়া সত্য সত্যই আকাশের গায়ে স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিল। এখন আর সন্দেহের কোন কারণই রইল না। সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেরা আনন্দে করতালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

কাপ্তেনের নজর যাতে তাদের উপর পড়ে এই উদ্দেশ্যে টমশন বিপদ জ্ঞাপক একটা নিশান ঘন ঘন আন্দোলিত করতে লাগল। একটু বাদে স্পষ্টই দেখা গেল যে, জাহাজের কাপ্তেন খানকয়েক জীবন রক্ষা তরী নামিয়ে দিচ্ছে। জীবন রক্ষা তরীগুলি ধীরে ধীরে নৌকোর পাশে এসে একে একে ভিড়লে বালকেরা তাতে উঠে পড়ল এবং একটু বাদেই জাহাজে গিয়ে উঠল।

জাহাজখানি ফ্রান্সের, তাই ডিক্ মাতৃ ভাষায় তাদের বিপদের আগাগোড়া ঘটনা সব কাপ্তেনের কাছে বর্ণনা করল। এই ঘটনা সারা ইউরোপে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তাই কাপ্তেন পরম আগ্রহে তাদের থাকবার সব রকম সুখ-সুবিধা ক'রে দিল।

জাহাজখানিও নিউজিল্যাণ্ডের দিকেই যাচ্ছিল, তাই ছেলেরা নিশ্চিন্ত আরামে জাহাজে দিনগুলি কাটাতে লাগল।

ক্রমে নিউজিল্যাণ্ডের উপকূল দেখা গেল। বহুদিনের ভুলে-যাওয়া কথা ছেলেদের প্রাণে নতুন ক'রে জেগে উঠল। আবার জন্মভূমি দেখতে পেয়ে তাদের উল্লাসের আর অন্ত ছিল না।

ধীরে ধীরে জাহাজখানি গিয়ে জেটীতে ভিড়ল। কাপ্তেন নিজে সঙ্গে ক'রে ছেলেদের নিয়ে ডাঙার পানে রওনা হ'ল। তাদের আসার খবর দেখতে দেখতে সারা শহরময় রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ল। অবিলম্বে অসংখ্য নরনারী তাদের দেখবার জন্যে ছুটে এল। ছেলেদের অভিভাবকেরাও এ খবর পেলেন। তাঁরা পাগলের মত ছুটে এলেন—তাঁদের হারানো নিধিদের পাবার ব্যাকুলতায়। সন্তান-হারা মা-বাবার চোখের জলে রাজপথ ভিজে গেল !

তারপর যে যার ঘরে গিয়ে আঁধার ঘর আলোকিত করল।

শেষ